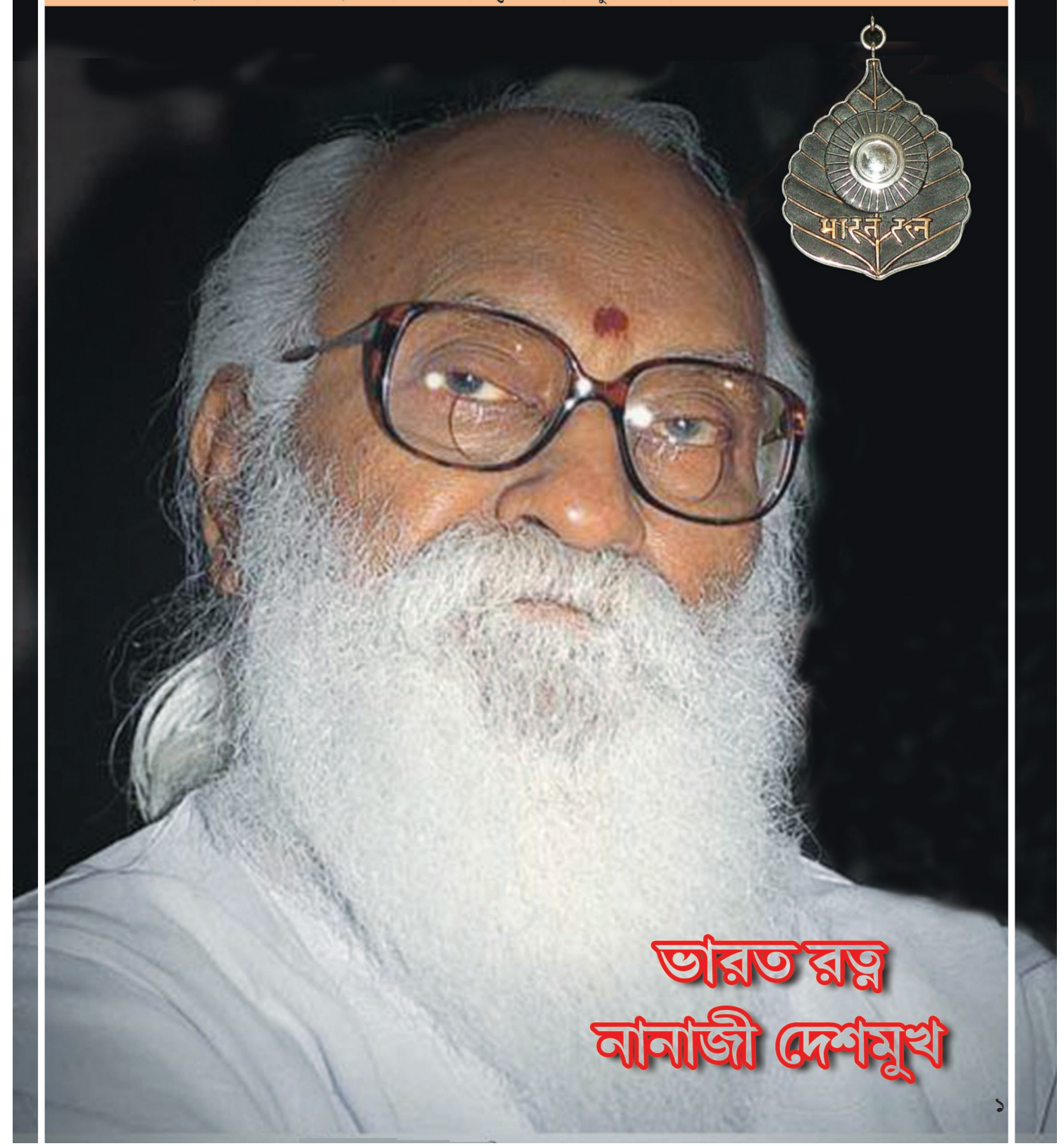
দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

মমতার প্রতি
মুসলমানদের মোহ
ভাঙা শুরু হয়েছে
— পৃঃ ২৭

ইভিএম হ্যাকিং
একটি রাজনৈতিক
ধাপ্পা ছাড়া
আর কিছুই নয়
—পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।। ১২ ফাল্গুন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



ভারত রত্ন
নানাজী দেশমুখ

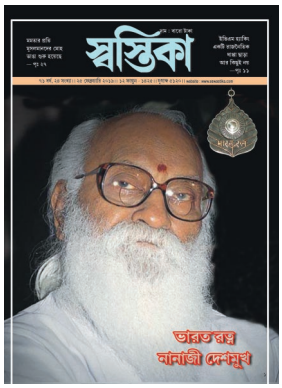
স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১২ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : পাকিস্তানকে ক্ষমা করবেন না, দিদিকে ক্ষমা করুন ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

মোদীর খাতায় রয়েছে সংস্কারের নতুন ভাঁড়ার ▯ অরবিন্দ পানাগেড়িয়া **▯ ৮**

ইভিএম হ্যাকিং একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয় ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার **▯ ১১**

চোরের মায়ের বড় গলা ▯ নরেন্দ্র সহগাল **▯ ১৩**

কংগ্রেসমুক্ত উত্তরপূর্বে প্রবল প্রতিরোধের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ▯ সাধনকুমার পাল **▯ ১৪**

জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লাগামহীন মিথ্যাচার আর কবে বন্ধ হবে ▯ বরুণ দাস **▯ ১৭**

গ্রামবিকাশের পুরোধাপুরুষ 'ভারতরত্ন' নানাজী দেশমুখ ▯ ধর্মানন্দ দেব **▯ ২৩**

নানাজী দেশমুখই গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে অন্ত্যোদয়ের পথ দেখিয়েছেন ▯ ড. স্বদেশ সিংহ **▯ ২৫**

মমতার প্রতি মুসলমানদের মোহ ভাঙা শুরু হয়েছে ▯ সুকল্প চৌধুরী **▯ ২৭**

প্রিয়ঙ্কার পক্ষে কংগ্রেসকে টেনে তোলা খুবই কঠিন ▯ সৌমেন ঘোষ **▯ ২৯**

পৌরাণিক নগর বঙ্গ ▯ গোপাল চক্রবর্তী **▯ ৩১**

নদীয়ার পরামায়া ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় **▯ ৩২**

নাথ সাধক মহাযোগী শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার **▯ ৩৩**

বিরোধীদের রামধনু জোট ভারতীয় গণতন্ত্রের পরীক্ষা ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ **▯ ৩৫**

বাংলার হিন্দু জমিদারদের উপর মুর্শিদকুলি খাঁ-র ভয়াবহ অত্যাচারের কিছু তথ্য ▯ তুষারকান্তি সরকার **▯ ৩৮**

কেন আমরা ভারতভূমিতে এলাম ▯ চন্দন রায় **▯ ৪৩**

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রভাব ▯ স্বপ্নময় মুখোপাধ্যায় **▯ ৪৫**

নিয়মিত বিভাগ

ভাবনা-চিন্তা : ৬ ▯ উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য : ২২ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ খেলার জগৎ : ৪১▯ অন্যরকম : ৪২ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
৪ মার্চ
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ মার্চ
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আলোচনা নয়, বদলা চাই

পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার পর একটা বিষয় স্পষ্ট। ইটের জবাবে পাটকেল না ছুঁড়লে পাকিস্তান কোনওদিনই জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করবে না। তাদের পাশে আছে চীন। ভারত যখনই জইশ-নেতা মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণা করার দাবি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবার করবে তখনই ভেটো প্রয়োগ করে সেই প্রয়াস বানচাল করে দেবে চীন। সুতরাং আর আলোচনা নয়, এবার বদলা নিক সেনা। দেশ তাই চায়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় পুলওয়ামায় চুয়াল্লিশ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যু। তিনটি বিশেষ রচনায় উঠে আসবে কেন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা অবান্তর। কেনই বা এখনই উপযুক্ত জবাব দেওয়া জরুরি। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

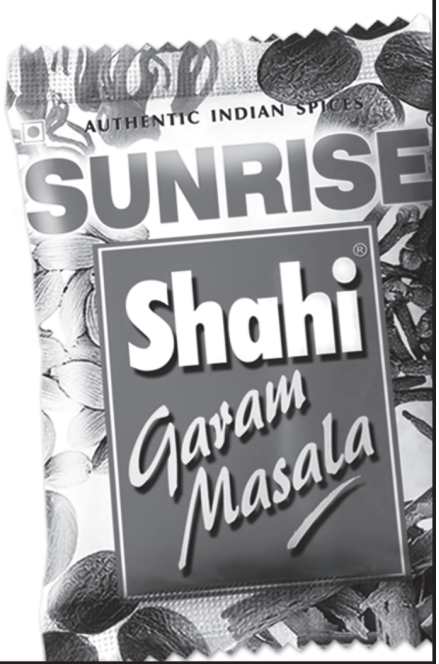
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা



SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে

নানাজী দেশমুখকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক কথায় বলিতে গেলে যোগ্য ব্যক্তিত্বকেই যোগ্য সম্মান অর্পণ করা হইয়াছে। নানাজী দেশমুখের মতো একজন ব্যক্তিত্বের এই সম্মান আরও বহু পূর্বেই প্রাপ্য ছিল। তবে ইহাও ঠিক, নানাজী দেশমুখের মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে কোনও সম্মানই তাঁহার উচ্চতার পরিমাপক নহে। তাঁহার আসন দেশবাসীর হৃদয়ে, তাঁহার স্বীকৃতি তাঁহার সমগ্র জীবনে, তাঁহার কর্মে। নানাজী হইতেছেন এই দেশের সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের অন্যতম, যাঁহারা শুধুমাত্র নিজের নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন নাই, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে জীবন অতিবাহিত করেন নাই। বরং সমগ্র দেশের জন্য, দেশের নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের স্বার্থেই তাঁহাদের এই জীবন ধারণ; তাহাদের স্বার্থেই সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের যে শিক্ষা, নরনারায়ণের সেবার যে বাণী, তাহাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল নানাজীর কর্মে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজা পর্যায়ের সংগীতের একটি পঙক্তি নানাজীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি হইতে পারে—'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো/ পাগল ওগো, প্রেমিক ওগো, সাধক ওগো ধরায় আসো...'।

অতি বালক বয়সেই নানাজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সংস্পর্শে আসেন। বলিতে গেলে, ডাক্তারজীর ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাধারা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে সঙ্ঘের সমাজবিকাশ মূলক কর্মে আত্মনিয়োজিত করিতে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে তিনি দায়িত্বভার পালন করিতে শুরু করেন। এই সময়ই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠন করেন, তখন দীনদয়ালজী এবং নানাজী দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গোলওয়ালকরজীর নির্দেশে শ্যামাপ্রসাদকে সাংগঠনিক কর্মে সহায়তা করিবার জন্য জনসঙ্ঘে নিজেদের নিয়োজিত করেন। সত্তরের দশকে জরুরি অবস্থার প্রাক্কালে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনেও নানাজীর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ১৯৭৭ সালে তিনি বলরামপুর লোকসভা হইতে সাংসদ নির্বাচিত হইবার পর মোরারজী দেশাই মন্ত্রীসভায় তাঁহাকে মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাব অবশ্য নানাজী সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। নানাজীর মতো বিরল ব্যক্তিত্ব কখনই ক্ষমতার মোহে অন্ধ হন নাই। ফলে অবলীলায় তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

নানাজী তাঁহার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক জীবনের জন্য যত না পরিচিত, অধিক পরিচিত তাহার গ্রামোন্নয়নের কর্মকাণ্ডে। গ্রামোন্নয়নে নানাজী যে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক কথায় বিরল। তাঁহার নিরলস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নানাজী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ, দীনদয়ালজীর অন্ত্যোদয় এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বোদয় ভাবনাকে একটি খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের দুঃখে ব্যাকুল হইয়া তিনি গ্রামোদয়ের যে প্রকল্প শুরু করিয়াছিলেন, তাহা ওই জেলার লক্ষ লক্ষ ভূমিপুত্রকে জীবনে নূতন আলোর দিশা প্রদর্শন করিয়াছিল। উত্তরপ্রদেশের এবং মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পশ্চাদপদ জনপদকে যে উন্নয়নের আলোয় আলোকিত করা যায়, নানাজী তাঁহার কর্মে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। নানাজীর কর্মের সুফলে আজ ওই অঞ্চল সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের প্রতীক।

ভারতরত্ন নানাজী দেশমুখকে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

সুভাষিতম্

শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশি, শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ, পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।।

চাঁদ আছে বলে রাত্রির শোভা, আবার রাত্রি আছে বলে চাঁদের শোভা। উভয়ের জন্যই আকাশের শোভা বৃদ্ধি পায়। জল আছে বলে পদ্মের শোভা, পদ্ম আছে বলে জলের শোভা। আর উভয়ের জন্যই জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি পায়।

বাজেটের বিরুদ্ধ প্রচার প্রায় বায়বীয়

শেখর সেনগুপ্ত

সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। অগোছালো কিংবা সাজানো গোছানো পারস্পরিক অভিঘাতময় এই সময়ের ক্যানভাসে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রীর বাজেট পেশ একটা খুব বড়োসড়ো ব্যাপার। সর্বস্তরের মানুষের তুমুল আগ্রহ ছিল এই বাজেট নিয়ে। বিশেষত এই বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের বেদনা-অধ্যুষিত অনিরাপদ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসবার দিশা রূপে এই বাজেটের দিকেই দীর্ঘকাল তাকিয়ে ছিলেন। এরকম বহু জনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সংসদের রঙ্গমঞ্চে একটার পর একটা প্রস্তাব যখন উচ্চারিত হয়েছে, তাঁরা খুশি হয়েছেন এবং নীরবে তাঁদের দ্বারা নিবিড়ভাবে অভিনন্দিত হয়েছে এই জীবনমুখী বাজেট প্রস্তাব। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিত্তমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল যে দৃঢ়তা ও কৌশলের সঙ্গে বাজেট ভাষণ সমাপ্ত করেন, ভাবে ও ধারে তা বেশ শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সংসদীয় বনেদিয়ানার নজির। স্পষ্টই প্রতিভাত যে এই অন্তর্বর্তী বাজেট তথা ভোট অন অ্যাকাউন্ট স্বস্তির অন্তর্গূঢ় বাঁধনে বেঁধে ফেলতে পেরেছে তিন ধাপের নাগরিকদের— মধ্যবিত্ত, দরিদ্র কিষাণ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মরত জোয়ানরা। তাঁদের বহুদিনের দাবি কিংবা প্রত্যাশাকে এবারের বাজেটীয় সাম-আপে বাস্তবায়িত হতে দেখলেন। টিভির স্ক্রিনে চোখ রেখে সজাগ কানকে পেতে আদ্যোপান্ত শুনেছি কেতাদুরস্ত ইংরেজি ও হিন্দিতে মিঃ পীযূষ গোয়েলের উচ্চারিত প্রতিটি প্রসঙ্গ এবং তার তুলনামূলক ব্যাখ্যা। অর্থনীতির নগণ্য ছাত্র রূপে আমার কিন্তু বারেকের জন্যও মনে হয়নি, তিনি কেবল নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন বাস্তব প্রতিবন্ধকতাগুলিকে। তাই এই বাজেটকে ঠিক ঠিক বিশ্লেষণ না করেই যেভাবে একাধিক বিরোধী নেতা-নেত্রী শুধুমাত্র কতগুলি নেগেটিভ বিশেষণ আওড়াতে থাকলেন, আমার তখন মনে হলো, এঁরা আদতে একেবারে ছেঁদো যুক্তিহীন প্রতারণামূলক রাজনীতিতেই অভ্যস্থ এবং বেপরোয়া রেকলেসনেস নিয়েই তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন। লাগামছাড়া মন্তব্য করেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার স্বপ্ন দেখেন। হিসেবপত্তরে তাঁদের প্রচুর ভুলচুক। প্রতিশ্রুতিতেও তাই থাকে প্রভূত অনিশ্চয়তা। একজন রাজনীতি নিরপেক্ষ নাগরিক হিসেবে আমি কিন্তু ওই বাজেটে বহু ইতিবাচক পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি এবং মনে হয়েছে, সংসদে যে দল হঠকারিতা দেখিয়ে এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করবে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচারে সেই দল অবিবেচক ক্ষতিকারক রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে পরবর্তী দিনগুলিতে। ওই ধরনের রাজনৈতিক কুশীলবরা যে প্রত্যাশাই করে থাকুন, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কিন্তু নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলির স্বপক্ষে নির্দ্বিধায় সোচ্চার হয়েই থাকব :

(১) ৫ লক্ষ টাকা অবধি আয়ে কোনও আয়কর ধার্য হবে না।

(২) অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে সকল কর্মী এ যাবৎ অবসরভাতা পেতেন না, অতঃপর তাঁদের মাসিক পেনশন হবে ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা।

(৩) প্রত্যেক দরিদ্র কৃষিজীবীর যেন নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে, যে অ্যাকাউন্টে কেন্দ্রীয় সরকার ২ হাজার টাকা করে ৩ বারে মোট ৬ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে জমা করে দেবেন প্রতি বৎসর।

(৪) গ্র্যাচুইটির উর্ধ্বসীমা এতদিন ছিল ১০ লক্ষ টাকা। এই বাজেট প্রস্তাব সংসদে অনুমোদিত হলে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৩০ লক্ষ টাকা। ভবিষ্যতে যাঁরা অবসর নেবেন, তাঁরা নিশ্চয় কুর্নিশ করবেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে।

(৫) দেশের সৈনিকদের বহু বছরের আন্তরিক প্রত্যাশা— 'এক পদ, এক 'পেনশন'। কংগ্রেসি জমানায় এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকৃতি পায়নি। বর্তমান বিজেপি সরকার কিন্তু তাঁদের বাজেট প্রস্তাবে জওয়ানদের এমনতর প্রত্যাশাকে মান্যতা দিলেন।

(৬) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'উজ্জ্বলা প্রকল্প'-এর কল্যাণে এদেশে এ অবধি ৬ কোটি দরিদ্র পরিবার নি-খরচায় পেয়ে আসছেন রান্নার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার। এই বাজেট প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হলে উক্ত সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৮ কোটি।

(৭) ২০২০ সন অবধি তাবৎ গৃহ ক্রয়/নির্মাণের ক্ষেত্রে আয়করের ছাড় পাবেন সংশ্লিষ্ট করদাতা।

(৮) পশ্চিমবঙ্গের বরানগর-দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়া- বারাসত অবধি প্রস্তাবিত মেট্রোরেল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হতে পারে।

(৯) যে কোনও ধরনের পশুপালনে সরকারি সহায়তা মিলবে কেন্দ্রের কাছ থেকে। এই বাবদ বরাদ্দ করা হবে ৭৫০ কোটি টাকা।

(১০) রেলের যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল অপরিবর্ধিত থাকছে।

(১১) ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে সরকার তাঁর বরাদ্দের পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে করবেন ৬০ হাজার কোটি টাকা।

(১২) বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অবধি টিডিএস নিষ্প্রোয়জন।

(১৩) ব্যাঙ্ক ও পোস্টঅফিসে প্রাপ্ত সুদের ৪০ হাজার টাকা অবধি থাকবে করমুক্ত।

ইত্যাকার হরেক কিসিমের সুবিধা ও নিষ্কৃতি দেবে যে বাজেট, তা গণঅভিনন্দিত যে হবে, তার বেশ কিছু সবুদ আমি নিজেই পেয়েছি। তবুও বিরোধী পক্ষীয় নেতা-নেত্রীরা তো নিশ্চল, স্থবির হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁরা এখন চেষ্টা করছেন বিচিত্র এবং আনফোরসিন বিপর্যয়ের কিছু টুকরো টুকরো ছবি দেখিয়ে নাগরিকদের বিভ্রান্ত করতে। এই বঙ্গে প্রায় সব চ্যানেলেই ব্রেকিং নিউজে স্থান পেতে তাঁদের জান কবুল। দরকার মতো খবরও বানাতে হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপে। আমরা, সাধারণ মানুষরা এটা ঠিক বুঝতে পারি। প্লিজ, আর বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না।

এই আলোচনাকে সার্বিক করতে গেলে একটা গোটা বই লিখে ফেলতে হয়। সেই অবকাশ এই মুহূর্তে নাস্তি। পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন স্তম্ভে বিশ্লেষণের বাসনা রইল। ▮

পাকিস্তানকে ক্ষমা করবেন না, দিদিকে ক্ষমা করুন

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

চিঠি লেখার মতো মানসিক অবস্থা নেই। কিন্তু লিখতেই হবে। কাশ্মীরের হামলা, জঘন্য হামলা, বীভৎস হত্যালীলা, কাপুরুষোচিত। জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সি আর পি এফ কনভয়ে যে হামলা হলো, তা নিন্দার জন্য কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়।

এত ভয়াবহ রক্তপাত শেষ কবে দেখেছে উপত্যকা? ২০১৬ সালে উরির সেনা ছাউনিতে ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল। ১৯ সেনাকর্মীর প্রাণ গিয়েছিল। সে হামলায় স্তম্ভিত হয়েছিল গোটা ভারত। কিন্তু পুলওয়ামায় যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড চালানো হলো, ভয়াবহতায় তা উরি হানার চেয়েও মারাত্মক। জঙ্গি হামলার ভয়াবহতা সংক্রান্ত তুল্যমূল্য বিচারে আটকে থাকার সময় অবশ্য এটা নয়। সময়টা জাতীয় শোকের, সময়টা প্রত্যুত্তরের অঙ্গীকার নেওয়ার।

একই সঙ্গে শত্রুদের যারা সমর্থন করছে তাদের চিনে নেওয়ার সময়। পাকিস্তানকে কেন দোষারোপ করা হলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, বিশদে তদন্ত না করেই কেন প্রতিবেশী দেশকে দোষারোপ। গোটা দেশ যখন জঘন্য হত্যার নিন্দা করছে তখন তিনি নিন্দায় মেতেছেন দেশের। সরকারের নিন্দা করে চিনিয়ে দিয়েছেন নিজেকে।

আধা সামরিক বাহিনী সিআরপিএফের উপরে যে ভয়ঙ্কর আঘাত নেমে এল, তাতে গোটা দেশ বিচলিত। সমগ্র ভারতবাসী সমবেদনায় একাত্ম সিআরপিএফ-এর সঙ্গে। কিন্তু এ ভাবে রক্তের উৎসবে মেতে যে ভারতকে দুর্বল করা যাবে না, সেই বার্তাটা দেশের চরম শত্রুদের দেওয়া এখন খুব জরুরি এবং সমগ্র ভারত সেই প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সেই অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু প্রিয় দিদি, কেন এমন কথা বললেন, এমন এক জরুরি সময়ে? তার পরেই মোমবাতি নিয়ে মিছিল কেন করলেন?

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানার যে উপাখ্যান দশকের পর দশক ধরে লেখা হচ্ছে, তার সবচেয়ে রক্তাক্ত অধ্যায়গুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে পুলওয়ামার এই হামলা। জইশ ই মহম্মদ এই হামলার দায় সোল্লাসে স্বীকার করেছে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে এভাবে আঘাত করতে পেরে জঘন্য ষড়যন্ত্রীরা সম্ভবত উৎসব শুরু করেছে। কিন্তু প্রত্যেক ভারতীয়ের তরফ থেকে এই বার্তা আজ ষড়যন্ত্রীরা জেনে নিক যে, সমগ্র জাতি এই কাপুরুষোচিত হত্যালীলার বিরুদ্ধে সংহত, এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার প্রশ্নে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক দৃঢ় ভাবে রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াবে।

সন্ত্রাসবাদকে যে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু সন্ত্রাসের থাবা যখন এতটা করাল হয়ে ওঠে, তখন আর বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা দেখানোও চলে না। সহ্য যে করা হবে না, জওয়ানদের এই আত্মত্যাগ যে বৃথা যাবে না, সে বার্তা প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলে, ভারতকে কতদিন আর এই ভাবে ভয়াবহ রক্তপাতের সম্মুখীন হতে হবে? সহ্যের সীমা রয়েছে, ধৈর্যের বাঁধ রয়েছে। সেসব যখন অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রত্যাঘাতটাও যে সাংঘাতিক হতে পারে, কাশ্মীর উপত্যকায় বা উপত্যকার আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা চক্রান্তকারীরা এবং সন্ত্রাসের মদতদাতারা সেকথা ভালোভাবে বুঝে নিক।

সন্ত্রাসবাদীদের এবং সন্ত্রাসের মদতদাতাদের আরও একটা বার্তা খুব স্পষ্ট করে আজ দেওয়া জরুরি— এ রকম ঘৃণ্য আঘাত হেনে ভারতকে দুর্বল করা যাবে না, এ ভাবে রক্তের উৎসবে মেতে কোনও ষড়যন্ত্র সফল করা যাবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে লড়ছে ভারত। সন্ত্রাস যেভাবে ভারতকে আঘাত করেছে বারে বারে, পৃথিবীর আর কোনও গণতন্ত্রকে সম্ভবত সেভাবে সন্ত্রাসের নিশানা হয়ে উঠতে হয়নি। কিন্তু নিরন্তর আঘাতও ভারতের অগ্রগতি রুখে দিতে পারেনি, একের পর এক জঘন্য ষড়যন্ত্র ভারতীয়দের মনোবল ভাঙতে পারেনি। প্রত্যেকটা আঘাত দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিয়েছে এই সুবিশাল জাতির। এবারও বজ্র কঠিন অঙ্গীকার রইল— সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারত আগের চেয়েও দুর্জয় হয়ে উঠবে। উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা শুরু করে দিক ষড়যন্ত্রীরা।

কিন্তু দেশের মধ্যে যে ষড়যন্ত্রকারীরা রয়েছেন তাতের কী হবে? যারা প্রকারন্তরে জঙ্গিদের মদত দিয়ে চলেছেন তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময়ও তো এসে গিয়েছে।

— **সুন্দর মৌলিক**

মোদীর খাতায় রয়েছে সংস্কারের নতুন ভাঁড়ার

অতিথি কলম



অরবিন্দ পানাগোড়িয়া

স্বাধীনতার সূচনা সময়ে ভারতে ছিল নির্মম দারিদ্র, অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক নানান সামাজিক সূচক ও প্রাথমিক পরিকাঠামোহীন একটি দেশ। স্বাধীনোত্তর কর্মকাণ্ডের শুরুতে দেশ সমাজবাদী অর্থনীতিকেই দেশ চালনার মডেল হিসেবে বেছে নেয়। এরই অঙ্গাঙ্গী ছিল লাইসেন্স পারমিট রাজ, সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিতরণ ও মূল্য নির্ধারণ এবং অতি প্রাচীনপন্থী এক বাণিজ্যনীতি। অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে চারটি দশক ধরে অর্থনৈতিক প্রগতি ছিল নিতান্তই ঢিমেতালে। পরিবর্তনের প্রথম ঘণ্টাটি বেজেছিল যখন প্রথম উদারনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়াস নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া ১৯৮০ সালে প্রথম দায়সারা ভাবে শুরু হলেও ১৯৯১ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক গতিতে এগোতে থাকে। কিন্তু যেহেতু প্রারম্ভিক চারটি দশক অতি নগণ্য উন্নয়নের কানাগলিতে হারিয়ে গিয়েছিল তাই সাম্প্রতিক উন্নয়ন দ্রুত অগ্রসরমান হলেও দেশের সমস্যাগুলির পরিমাণ এখনও বিপুল। এই পরিস্থিতিতে যদি কেউ সমালোচক হিসেবে ভারতের এ যাবৎ ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলির এখনও না মেটা সমস্যা সমূহের নিরিখে বিচার করতে যান তিনি মনের আনন্দে তালিকা তৈরি করতে পারবেন। যেহেতু শেষ যে সরকার ক্ষমতাসীন সেটি নরেন্দ্র মোদীর, তার ফলে 'সব বেটাকে ছেড়ে বেড়ে ব্যাটাকে ধর' প্রচলিত বাক্যটি মেনে তাঁরা মোদীকে সহজ টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

তাঁদের এই অসার সমালোচনা অবশ্য কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। উল্টে ব্যুমেরাং হয়ে তাঁর পূর্ববর্তী দীর্ঘস্থায়ী সরকারগুলির ওপরই বর্তাবে। বলা দরকার যথার্থ মূল্যায়ন যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে উন্নয়নকে পরিমাপ করতে হবে পূর্ববর্তী সরকারগুলির সঙ্গে তুলনামূলক ভিত্তিতে। হ্যাঁ, এই মানদণ্ড ও অর্থনীতি গ্রাহ্য রীতি যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে এই উপসংহারকে এড়িয়ে কিছুতেই পালানো যাবে না যে এই সরকার চমৎকার কাজ করেছে। আর এই সরকারের পরিবর্তে যদি পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকার ঘরানার কোনো বাধ্যতামূলক ভাবে বেছে নেওয়ার বিকল্প সরকার আসে (কেননা বাজারে বিকল্প অতি দুর্লভ), তবে যা আসবে তা হবে ইউপিএ সরকারের উনিশ-বিশ যা দেশকে অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের পথে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রথম ইউপিএ সরকার এতটাই ভাগ্যবান ছিল যে অটলবিহারীর রোপিত বীজ যখন সোনালি শস্যের রূপ নিয়েছে তারা অকাতরে তার লাভ তুলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাদের ইনিংসে তারা কোনো কাজ না করে শস্যক্ষেত্রটিকে তো চষেইনি, বরং তার ওপর সুফলভোগ করার উচ্ছিষ্টগুলি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

এই নিবন্ধের স্থান অকুলান হেতু এই সরকারের উন্নয়নমুখী গৃহীত নীতিগুলির সামগ্রিক তালিকা তুলে ধরার অসুবিধে রয়েইছে। তবে এই ধরনের বিস্তারিত বিবরণী তুলে ধরার তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই। কেবলমাত্র তিনটি বড়ো ধরনের সংস্কারের কথা তুলে ধরলেই যথেষ্ট নমুনা পেশ হবে বলে মনে করি। এগুলি ইতিমধ্যেই কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়েছে। (১) ইনসলভেন্সি ও ব্যাঙ্করাপ্সি কোড, (২) গুডস ও সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি), (৩) ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (সরকারি যে কোনো ভাতা ভরতুকি সবই উপভোক্তার ব্যাঙ্ক খাতায় সরাসরি জমা হবে, ডিবিটি)। এই ধরনের সংস্কারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনো সংস্কার বিগত ১০ বছরের দু'টি ইউপিএ সরকারের জমানায় হয়েছে কিনা খুঁজতে গিয়ে তোলপাড় করেও আমার নজরে কিছু আসেনি। ইউপিএ সরকারের নেওয়া যে বড়ো ধরনের প্রকল্পগুলি নিয়ে ডঙ্কা বাজানো হয় যেমন মনরেগা, জাতীয় খাদ্য নিশ্চয়তা প্রকল্প বা শিক্ষার অধিকার এই সমস্ত প্রকল্পগুলি সবই মূলত সামাজিক ন্যায় যা কখনই কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে না, ফলে অর্থনীতিরও কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় না।

বছর পাঁচেক আগের একটি গণ-বিতর্ক সভায় বিগত সরকারের এক মন্ত্রী তৎকালীন সরকারের তরফে সাফাই দিতে গিয়ে অতি উচ্চ হারে বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দাখিল করছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে কী ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়া ওই সরকার হাতে নিয়েছিল তার যদি দু' একটা উদাহরণ তিনি দেন তাহলে বৃদ্ধির

কারণ বুঝতে সুবিধে হবে। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। আমি কিন্তু এই সূত্রে একটা কথা বার বার বলে এসেছি যে, আগের দুই প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ও অটলবিহারী বাজপেয়ী যে সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বাস্তবায়িত করেছিলেন পরবর্তী ইউপিএ সরকার দুটি তারই প্রলম্বিত লাভ ভোগ করেছে।

টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, অটোমোবাইল, দু'চাকার গাড়ি, নাগরিক উন্নয়ন ও সফটওয়ার শিল্পের ক্ষেত্রে যে অসামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে ওই সমস্ত সংস্কারগুলির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। ইউপিএ সরকার, না বর্তমান মোদী সরকার কে অর্থনীতিতে বেশি বৃদ্ধি ঘটাতে পেরেছে তাই নিয়ে শুরু হওয়া নিরন্তর বিতর্কগুলিতে এই বিষয়টা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রথম ইউপিএ সরকার এতটাই ভাগ্যবান ছিল যে অটলবিহারীর রোপিত বীজ যখন সোনালি শস্যের রূপ নিয়েছে তারা অকাতরে তার লাভ তুলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাদের ইনিংসে তারা কোনো কাজ না করে শস্যক্ষেত্রটিকে তো চষেইনি, বরং তার ওপর সুফলভোগ করার উচ্ছিষ্টগুলি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী সরকারের প্রথম বছরটি জঞ্জাল সাফ করতেই কেটে যায়। দেশে শস্যক্ষেত্র সম উৎপাদন ক্ষেত্রকে সচল করতে শিল্পদ্যোগীদের পুরনো Retrosprective Tax (আগেকার বছরের ওপর পুর্নবার কর দেওয়া)-এর মতো উৎপাদন ক্ষেত্রের পক্ষে চরম ক্ষতিকর করপ্রথা বিলোপ, মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা পরিকাঠামো ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলিকে ছাড় পত্র ও আমলাতন্ত্রের পঙ্গুত্বকেও সামাল দিতে হয়।

এই ব্যাপক প্রশাসনিক অবহেলা পর্যালোচনা করার পর কেউ কি বুক বাজিয়ে বলতে পারবেন যে বিরোধী দলগুলির পাঁচ মিশেলি সরকার যদি হয় তারা যে আবার এমনই নেতিবাচক পরিস্থিতিকে টেনে আনবে না? বিরোধীপক্ষের মধ্যে আমার



মনে হয় একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু ছাড়া কেউই মনে করেন না যে বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কোনোদিনই সম্ভব নয়। এই কাণ্ডজ্ঞানহীনরা মনে করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ভারত বরাত জোরেই পেয়ে যেতে বাধ্য। আর বৃদ্ধির ভাণ্ডার দু'হাতে খরচ করে 'কামধেনু'র মতো চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, নীতিগতভাবে এ পর্যন্ত একটিই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা দৃঢ়ভাবে শোনা গেছে, তা হলো দেশব্যাপী সকলের জন্য ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রকল্প। এটি রাহুল গান্ধীর প্রতিশ্রুতি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিগত ইউপিএ সরকারের ঘরানার মতো এটিও সঞ্চিত সম্পদ বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার নতুন বোতলে পুরনো মদ। এটি জন্মসূত্রেই মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত।

প্রাথমিক ভাবে এই পরিকল্পনাটি সকলের জন্য একটি প্রাথমিক আয় বলে ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রবীণ চক্রবর্তী যিনি কংগ্রেস দলের পরিসংখ্যান বিশ্লেষক গোষ্ঠীর প্রধান তিনি বললেন যে, সকল নাগরিককে একটি পূর্ব নির্ধারিত ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। এর নির্যাস দাঁড়াল এই যদি কারুর আয় পূর্ব নির্ধারিত ন্যূনতম আয়ের চেয়ে কম থাকে তাহলে সরকার তাকে সেই ঘাটতিটুকু পূরণ করে দেবে। উদাহরণটা এরকম যদি নির্ধারিত ন্যূনতম আয় ১০ হাজার টাকা ধার্য হয় আর লোকটি ইতিমধ্যে ৬ হাজার টাকার রোজগেরে হয় সেক্ষেত্রে তাকে কেবল ৪ হাজার টাকাই দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পের মারাত্মক ভুল এটাই যে যদি কেউ বুঝে নেয় তার পক্ষে ১০ হাজার টাকার কাজ জোটানো কোনোভাবে সম্ভব নয় তাহলে সে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে। কেননা সে তো নিষ্কর্মা হয়েই ১০ হাজার পেয়ে যেতে পারে। সত্যিই তো দুনিয়ায় কে আর এমন বোকা আছে যে খেটে মরে ৬ হাজার টাকা রোজগার করবে যা সরকারি দানের (১০ হাজার) দেওয়ার আগে কেটে নেবে।

কংগ্রেসকে সামাজিক প্রকল্পে খরচ করতে হলে কোনো ভালো বিকল্প খুঁজতে হবে বিশেষ করে উন্নয়নমুখী কোনো সংস্কার যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের বোঝা উচিত 'কামধেনু' একটি মিথ বা অতিকথন, বাস্তবে তা কোনোদিনই ঘটে না।

(লেখক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

রম্যরচনা

● এক সরকারি অফিসার সদ্য চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন সরকারি অফিসে চাকরি করার অভ্যাসগুলি ছাড়তে পারেননি। রোজ সকালে অফিসে যাওয়ার জামাকাপড় পরে টেবিলে বসে থাকেন আর নানারকম হুকুম করতে থাকেন। একদিন বউ বাজারের ফর্দ হাতে ধরিয়ে বাজারে যেতে বললে, উনি প্যাডের পাতায় নোট লিখে পাঠালেন— এ জিনিসগুলো কেন কেনা হবে তা জাস্টিফাই করুন।

বউ পাল্টা লিখে পাঠালেন কেন বাজারে গিয়ে এগুলো কেনা দরকার।

ভদ্রলোক আবার পাল্টা নোট পাঠালেন— বাজেটে স্যাংশন নেই। পরের আর্থিক বছরে দেখা যাবে।

বউ এবার রেগেমেগে বললেন— আমি বাপের বাড়ি যাব।

ভদ্রলোক নোট পাঠালেন— অফিসিয়ালি ছুটির দরখাস্ত করুন।

বউ ছুটির দরখাস্ত করলেন। এবার ভদ্রলোকের নোট— সাবস্টিটিউট না আসা পর্যন্ত ছুটি দেওয়া যাবে না।



উবাচ



“পাকিস্তানের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। আর নয়। এবার অ্যাকশন নেওয়ার পালা।”

পুলওয়ামায় জওয়ানদের ওপর জঙ্গি হানা প্রসঙ্গে

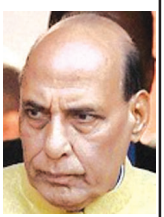
নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী



“আমার বাবলু ফিরে আসবে না। কিন্তু বাবলুদের হত্যাকারী জঙ্গিদের নিকেশ হওয়ায় বাবলুর আত্মা শান্তি পাবে।”

জঙ্গি কামরান নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে খতম হওয়া প্রসঙ্গে

বনলতা দেবী
নিহত জওয়ান বাবলু সাঁতরার মা



“পরিস্থিতি যাই হোক। সেনাবাহিনীর মনোবল এখন তুঙ্গে। তারা কীভাবে জঙ্গি দমন করছেন দেখুন।”

পুলওয়ামার ঘটনার পর জঙ্গি দমনে সেনা অভিযান প্রসঙ্গে

রাজনাথ সিংহ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



“দেশভক্তির কথা বলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত কুণ্ঠা কেন? আর এস এস বিজেপি দেশপ্রেমের কথা বলে কী অন্যায়টা করেছে?”

আর এস এস-বিজেপিকে মুখ্যমন্ত্রীর দোষারোপ করা প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি রাজ্য সভাপতি



“পুলওয়ামার ঘটনার পর নভজ্যোত সিংহ সিধু যে বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্য কংগ্রেস তাকে বহিষ্কার করুক। সিধুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও করা উচিত।”

পাকিস্তানের সমর্থনে নভজ্যোত সিংহ সিধুর বক্তব্য প্রসঙ্গে

প্রকাশ সিংহ বাদল
অকালি দলনেতা

ইভিএম হ্যাকিং একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়

প্রণব দত্ত মজুমদার

উনিশের লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক তত মাথাচাড়া দিচ্ছে। এনডিএ-র বিরোধীরা যথারীতি তাদের স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় ইভিএম হ্যাকিং নিয়ে হৈচৈ আরম্ভ করে দিয়েছে।

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৯-এ সৈয়দ সুজা নামে এক স্বঘোষিত হ্যাকিং বিশেষজ্ঞ Indian Journalists Association (IJA) কর্তৃক লন্ডনে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে আমেরিকায় বসে বলেছেন ২০১৪ সালের নির্বাচনে তিনি নাকি এন ডি এ-র পক্ষে হ্যাকিং করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন তিনি নাকি তখন Electronics Corporation of India (ECIL), যারা ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ইভিএম তৈরিতে যুক্ত ছিল তাদের 'design & development' সেলে কর্মরত ছিলেন। এই খবরে সারাদেশের রাজনৈতিক মহলে এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে হৈচৈ পড়ে যায়। এনডিএ বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা সাঙ্ঘাতিক লাফালাফি আরম্ভ করে দিলেন। ওইসব রাজনৈতিক দলের পেটোয়া চ্যানেলগুলি ইভিএম নিয়ে বিতর্কের সান্ধ্য আসর বসিয়ে দিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হলো ওইসব সান্ধ্য বিতর্কের আসরে ইভিএম-এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর মেশিনের আলোচনায় সর্বজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা বা সাংবাদিকরা থাকলেও এ ব্যাপারে কোনো প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞের মতামত প্রচারিত হয়নি। ওইসব আলোচনা এবং প্রকাশিত সংবাদ থেকে যে তথ্যগুলো উঠে আসে তা হলো—

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিলেন মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার। ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার বলয়ের মধ্যে, ECIL-এর যেসব প্রযুক্তিবিদ ইভিএম তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সবার অজ্ঞাতসারে, concerned সমস্ত সরকারি মেশিনারিকে প্রভাবিত করে বা অন্ধকারে রেখে বিরোধী পক্ষের কতিপয় হ্যাকারের পক্ষে অত্যন্ত গোপনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে অত্যন্ত উচ্চস্তরের সূক্ষ্ম ও জটিল প্রযুক্তির মাধ্যমে এই কাজ কী করে করা সম্ভব হলো সে প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

ECIL-এর পক্ষে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় যে সৈয়দ সুজা নামে কোনো ব্যক্তি তাদের প্রতিষ্ঠানের 'design & development' ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন না। এ ব্যাপারে সুজার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধি (IPC) ৫৪৩ ধারায় এফ আই আর দায়ের করা হচ্ছে।

দেখা গেল লন্ডনে উক্ত প্রেস কনফারেন্সটির আয়োজন করেছে Indian Journalists Association (IJA); এবং এর পুরোভাগে ছিলেন IJA-র প্রেসিডেন্ট আশিস রায় যিনি আবার কংগ্রেসের হয়ে 'সোশাল-মিডিয়া'তে campaign করেন এবং লন্ডনে রাহুল গান্ধীর public event অর্গানাইজ করেন। এই প্রেস কনফারেন্সে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা কপিল সিব্বাল উপস্থিত ছিলেন। এতে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে এই অপপ্রচারের পেছনে কংগ্রেসের চক্রান্ত আছে।

সৈয়দ সুজা এই প্রেস কনফারেন্স সরাসরি উপস্থিত ছিলেন না। আমেরিকায় বসে মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে 'স্কাইপ' প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিকনফারেন্সে কথা বলছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনোরকম প্রমাণ তিনি পেশ করেননি।

একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির মুখের কথা লুফে নিয়ে বিজ্ঞ বিরোধী নেতারা লাফালাফি আরম্ভ করে দিলেন যে ২০১৪-তে ইভিএম হ্যাক হয়েছিল। তাঁরা ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভারতের নির্বাচন আধিকারিকের কাছে ইভিএমের বদলে পেপার ব্যালটের দাবি করলেন।

মুখ্য নির্বাচনে আধিকারিক সুনীল অরোরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে ব্যালট পেপারের মতো পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। ইভিএম-এর মাধ্যমে নির্বাচনে যখন বিরোধীরা জয় পায় তখন সব ঠিক, যখন পরাজিত হয় তখন ইভিএম হ্যাক হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এর আগে নির্বাচন আয়োগ রাজনৈতিক নেতাদের বারবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন তাঁরা যেন আয়োগের কার্যালয়ে এসে হাতে কলমে তাঁদের অভিযোগ প্রমাণ করেন। কিন্তু কোনো দলই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেননি।

ইভিএমে হ্যাকিং একটি অবাস্তব হাস্যকর কথা। সৈয়দ সুজার হ্যাকিং সম্পর্কে এই বক্তব্য একটি সাইন্স ফিকশন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা। টিভি চ্যানেলগুলো ইভিএম হ্যাকিং নিয়ে মশলাদার সান্ধ্যআসর না বসিয়ে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে এসে আলোচনা করালেই পুরো ব্যাপারটি দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এটা আমরা সবাই জানি ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ করলে তাতে ব্যালট পেপার লুট, ছাপ্পা ভোট, ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার ইত্যাদি নানারকম দুর্নীতির সুযোগ হাজার গুণ বেশি থাকে এবং অতীতে এইসব দুর্নীতি প্রভূত পরিমাণে হয়েছে এবং ব্যালট পেপার গোণার সময়ও প্রচুর দুর্নীতি অতীতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যালট পেপারের এইসব দুর্নীতি আমরা দেখেছি।

নির্বাচন আয়োগ সবসময়ই দাবি করেছেন অত্যন্ত উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদরাই ইভিএম তৈরি করেছেন এবং কিছুতেই তা হ্যাক করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে হ্যাকিং-এর প্রযুক্তিগত দিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ইভিএম হলো একটি সরল ক্যালকুলেটিং মেশিনের মতো যার মধ্যে

আছে একটি কন্ট্রোল ইউনিট যাকে যন্ত্রটির ব্রেন বলা যায়। একে ইলেকট্রনিক পরিভাষায় Microprocessor বলা হয়। এটির মধ্যে এমন ইলেকট্রনিক সার্কিট করা আছে যে একে যেরকম নির্দেশ দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী ম্যাথম্যাটিকাল ক্যালকুলেশন যন্ত্রটি করবে এবং তা মেমোরি ইউনিট-এ সংরক্ষিত করে রাখবে যা পরে বার করা যাবে বা পড়া যাবে। দূর থেকে অপারেট করা বা কন্ট্রোল করার মতো কোনো ব্যবস্থা (সার্কিট) ইভিএম-এ নেই। একটি ক্যালকুলেটারকে কি দূর থেকে অপারেট করা যায়?

ইভিএম-কে দূর থেকে অপারেট বা হ্যাক করতে গেলে এর সঙ্গে উচ্চ জটিল প্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক (device) ইউনিট যুক্ত করতে হবে যে কিনা দূর থেকে অত্যন্ত গোপনে পাঠানো বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রনিক সংকেত (signal) গ্রহণ (receive) করে ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিট বা microprocessor-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির পক্ষের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট টি অ্যাকটিভেট করবে। শুধু সঙ্কেত পাঠালেই হবে না। micro-processor যে ভাষাটি (কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ) বোঝে সেই ভাষায় সঙ্কেতকে রূপান্তরিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে চাইনিজ ভাষা বোঝে তাকে বাংলায় বললে সে কি নির্দেশ পালন করতে পারবে? অর্থাৎ উপযুক্ত সফট্ওয়ার-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা করতে গেলে তার জন্য ওই বিশেষ ইভিএম-এর ইলেকট্রনিক সার্কিটে হার্ডওয়ার এবং সফট্ওয়ার-এর সঙ্গে আরও কিছু হার্ডওয়ার এবং সফট্ওয়ার যুক্ত করতে হবে এবং এই ইলেকট্রনিক সংযোগ ঘটাবার জন্য এই নির্দিষ্ট ইভিএম-এর হার্ডওয়ার এবং সফট্ওয়ার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযুক্তিগত জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। হ্যাকারকে সেই বিশেষ জ্ঞান প্রথমে অর্জন করতে হবে তারপর তা প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সার্কিটযুক্ত একটি অতি ক্ষুদ্র ইউনিট বা চিপ অত্যন্ত গোপনে সকলের অগোচরে প্রত্যেকটি ইভিএম সার্কিট-এর সঙ্গে ইলেকট্রনিক্যালি যুক্ত করতে হবে। এই ইউনিট বা চিপকে (যে ইভিএম সার্কিটকে পরিচালিত করবে) কার্যকরী করার জন্য গোপনে দূর থেকে সিগন্যাল বা সংকেত পাঠাতে হবে।

রিমোট অপারেটিং ইউনিট থেকে নির্দিষ্ট ইভিএম-এ সঙ্কেত দু ভাবে প্রেরণ করা যেতে পারে। তারের মাধ্যমে বা বেতার প্রযুক্তিতে। হাজার হাজার ইভিএমের সঙ্গে তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণ করতে গেলে সেটা হয়ে যাবে অনেকটা টিভি-র 'কেবল অপারেটররা' যেমন কেবল (তার)-এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের জন্য শহরের সমস্ত ল্যাম্প পোস্ট বা রাস্তার ধারের গাছ ছেয়ে ফেলে সেইরকম। তা হলে সে কি আর গোপন থাকবে? সুতরাং চোখের আড়ালে তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠিয়ে হ্যাকিং সম্ভব নয়।

এবার আসা যাক 'বেতার প্রযুক্তি'তে হ্যাকিঙে। বেতার প্রযুক্তিতে রেডিয়ো ওয়েভস-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাতে হবে। এই রেডিয়ো ওয়েভস-কে গ্রহণ করার জন্য অ্যান্টেনা ইউনিট থাকতে হবে। এই অ্যান্টেনার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক নির্দেশ আরও কিছু জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিটের (যা চিপ ফর্ম-এ থাকে) মধ্য দিয়ে ইভিএম-এর কন্ট্রোল ইউনিট-এ ঢুকে তাকে অপারেট করবে। এই পুরো ইলেকট্রনিক ডিভাইসটিকে ইলেকট্রনিক পরিভাষায় বলা হয় ট্রান্সসিভার। ইভিএম-এর অপারেশনকে প্রভাবিত করার জন্য ট্রান্সসিভার চিপ তৈরি করতে গেলে এই ইভিএম-এর হার্ডওয়ার এবং সফট্ওয়ার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতেই হবে যা ইভিএম তৈরির সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তিবিদ ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এই Technical knowhow অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। ধরে নেওয়া যাক সেই প্রযুক্তি চুরি হয়ে গেল। এইরকম বিশেষ ধরনের ট্রান্সসিভার চিপ পাড়ার দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি কোম্পানি আছে যারা অত্যন্ত উচ্চতর জটিল প্রযুক্তির এইরকম চিপ তৈরির ক্ষমতা রাখে।

বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ মিস্টার ধীরাজ সিনহার মতে এইরকম এক একটি অতি ক্ষুদ্র চিপ (চক্ষুর আড়াল করতে অতি ক্ষুদ্র চিপ বানাতে হবে) ডিজাইন করতে গেলে প্রায় ২০ লক্ষ ডলার করে খরচ পড়বে। ইভিএম হ্যাক করতে গেলে প্রত্যেকটি ইভিএম-এর সঙ্গে এই বিপুল দামের বিশেষ ধরনের চিপ অত্যন্ত গোপনে বিশেষ প্রশিক্ষিত ব্যাক্তির দ্বারা যুক্ত করতে হবে। তাহলে সমস্ত ইভিএম-এর জন্য এই ব্যাবস্থা করতে গেলে কত কোটি টাকা লাগবে ভেবে দেখুন? হ্যাকার গোষ্ঠীর এই কোটি কোটি টাকার money transaction-কে গোপন রাখতে হবে।

গল্প এখানেই শেষ নয়। ধরা যাক কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার এইরকম চিপ তৈরি করে নির্বাচন কমিশনের নজরদারি এড়িয়ে হাজার হাজার ইভিএম-এর ভেতরে অত্যন্ত গোপনে এইসব চিপ টেকনিক্যাল এক্সপার্ট-এর মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হলো। তা হলেও নির্বাচন কমিশনের নজরদারি এড়িয়ে ইভিএম হ্যাকিং-এর পুরো কাজটি করা যাবে কি? Radio waves-কে গ্রহণ করার জন্য অ্যান্টেনা ইউনিটটিকে আড়াল করবেন কীভাবে? আমাদের ঘরের টিভি-র বেতার ব্যবস্থায় সিগন্যাল গ্রহণ করার অ্যান্টেনাগুলো দেখেছেন? এক একটি কড়াইয়ের মতো দেখতে— তাই জন্য তাকে ডিশ অ্যান্টেনা বলা হয়। সৈয়দ সুজা এখানে একটি চাল চেলেছেন। তিনি বলেছেন Reliance Communication নাকি তাকে এ ব্যাপারে সাপোর্ট করেছে। Reliance Communication-এর GSM frequecey band হলো ৮০০-১৮০০ MHz। এই মাপের frequency-র তরঙ্গ সংকেতকে ধরতে (receive) করতে গেলেও ক্ষুদ্রতম GSM-antennaটি হবে মোবাইলের মাপের। মোবাইলের অ্যান্টেনাটি ছোটো হলেও কিন্তু তা আড়াল করা সম্ভব নয়। মোবাইলের বাইরের কভারটি খুললেই একটি ধাতব প্যাচ (metallic patch) চোখে পড়বে। সেটিই মোবাইলের অ্যান্টেনা। অর্থাৎ হ্যাকিং-এর যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কিছুতেই আড়াল করা সম্ভব নয়; তা নির্বাচন আয়োগের বিশেষজ্ঞ সুপারভাইজারদের চোখে পড়বেই। যদি কোনো প্রযুক্তিবিদ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (ultra-small) transceiver chip তৈরি করতে পারেন যার সঙ্গে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী অ্যান্টেনা লাগানো থাকবে এবং যা অদৃশ্য থাকবে; এইরকম পরিপূর্ণ invisible transceiver device বানাতে পারলে তিনি অবশ্যই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবেন।

ইভিমে হ্যাকিং একটি অবাস্তব হাস্যকর কথা। সৈয়দ সুজার হ্যাকিং সম্পর্কে এই বক্তব্য একটি সাইন্স ফিকশন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা। টিভি চ্যানেলগুলো ইভিএম হ্যাকিং নিয়ে মশলাদার সান্ধ্যআসর না বসিয়ে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে এসে আলোচনা করালেই পুরো ব্যাপারটি দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

চোরের মায়ের বড় গলা

নরেন্দ্র সহগাল (সায়গল)

দেশের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এবং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী যাবতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় শিষ্টাচার জলাঞ্জলি দিয়ে অভব্যতার এক নজিরহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর মতো একজন সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকেও চোর বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। এই ব্যক্তি (রাহুল) নিজেই দুর্নীতি ও তছরুপের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বর্তমানে জামিনে মুক্ত। এহেন ব্যক্তি নিজের রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করতে সক্রিয়। এই অসৎ লোকেদের দল হলো কংগ্রেস।

এই দলটির নেতারা বিভিন্ন কেলেঙ্কারি এবং অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত। দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক। দলের নাম থেকে গোত্র অবধি সবই মিথ্যার বেসাতি। দলের পতাকা, নির্বাচনী প্রতীক, কার্যালয় এমনকী কার্যপদ্ধতি কোনো কিছুই নিজস্ব নয়। এই দল সংবিধান ও নৈতিকতার ধার ধারে না এবং নিজেকে জাতীয় কংগ্রেস বলে দাবি করে। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেস দলটিকে দুটুকরো করেন এবং কংগ্রেস (আই) তৈরি হয়। এটা বিস্ময়কর যে দেশের বুদ্ধিজীবী, সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, নেতারা কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক অসততা নিয়ে মুখ খোলেন না। নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে নীরব।

কিছুদিন আগে লখনৌতে রোডশোয়ের সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি ও জাতীয় সাধারণ সম্পাদিকার উপস্থিতিতে এবং উস্কানিতে সমবেত কংগ্রেস কর্মীরা স্লোগান দেয়— ''চৌকিদার চোর হ্যায়, চোর হ্যায়''। এতে গলা মেলান খোদ সভাপতি। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বারবার চোর চোর বলতে ক্লান্তিহীন কংগ্রেসের নিজের মুখ আয়নায় দেখা উচিত। দেশবাসী জানে আসল চোর কে। লখনৌতে চৌকিদারকে চোর বলে দলের নেত্রী অভিযুক্ত রবার্ট বঢরাকে সহমর্মিতা জানাতে জয়পুরে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী বঢরা ভুলে গেছেন তিনি দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। শ্রীমতী বঢরার আচরণ থেকে স্পষ্ট যে রবার্টের বিরুদ্ধে জমি কেলেঙ্কারি অভিযোগ কংগ্রেসের সমর্থন পুষ্ট।

দলের জাতীয় সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতারা বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান আগামী দিনে অভিযুক্তদের সংখ্যা আর বাড়বে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় রাহুল নিজেই জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর একই দশা। শ্রীমতী বঢরার যশোবরাতে (সিমলা) 'রবার্ট বঢরা স্টাইল'-এর কেনা প্রায় সাত একর জমিতে বেআইনি ভাবে তৈরি বাড়ি ও বাগান নিয়ে অভিযোগ উঠেছে।

দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা চিদম্বরমের বিরুদ্ধে সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে এবং বর্তমানে তিনি



বিচারাধীন। অনেক অভিযুক্ত, কেউ কেউ আবার সপরিবারে 'চৌকিদারের' হাতে ধরা পড়েছেন। এবার দেশের টাকা যারা আত্মসাৎ করতে বিদেশে পালিয়েছেন তাদেরও দুঃস্বপ্ন দেখার সময় এসেছে 'চৌকিদারের' কল্যাণে।

এখন দেখা যাক এই কংগ্রেস (আই) দলটির উৎপত্তি, উদয় কীভাবে, এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই দলটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মুখোশ পরে আছে। ৮০-র দশকে ইন্দিরা গান্ধী নিজের একছত্র আধিপত্য কায়েম করতে কংগ্রেস দলটি দুটুকরো করেন। সে সময় আদালত দলের অন্য প্রধান নেতাদের (সংগঠন কংগ্রেস/ আদি কংগ্রেস) আবেদনের সপক্ষে কংগ্রেসের কার্যালয় (যন্তরমন্তর একালাকায় অবস্থিত), দলীয় পতাকা, নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন (জোড়া বলদ) ইত্যাদি ব্যবহারের আদেশ দেয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (আই) গঠিত হয়। এই নতুন দলের নির্বাচনী চিহ্ন ছিল 'গাই বাছুর'। কালক্রমে এই নির্বাচনী চিহ্ন হয় 'হাত'। এর পরবর্তী সময়ে জরুরি অবস্থা জারি হলে অধিকাংশ বিরোধীদল অস্তিত্ব লোপ করে জনতা দল গঠন করে। আসল কংগ্রেস (আদি কংগ্রেস) জনতা দলে মিশে যায়। সুতরাং বর্তমান কংগ্রেস হলো মূলত কংগ্রেস (আই)।

একই ভাবে তথাকথিত নেহরু গান্ধী পরিবারের ইতিহাস কী বলে জেনে নেওয়া যাক। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে নেহরু পরিবারের উত্তরাধিকারী বলে মানা হয়, প্রচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এঁদের কেউই নেহরু বা গান্ধী নন। জওহরলাল নেহরুর কোনো ছেলে না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর নেহরু বংশ শেষ হয়। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরার বিবাহ হয় ফিরোজ খানের সঙ্গে। ফিরোজ খানকে গান্ধীজী 'গান্ধী' পদবি ব্যবহারের অনুমতি দেন। তাই এইসব গান্ধী আসলে ফিরোজ খানের বংশধর আর সোনিয়ার সঙ্গে রাজীবের বিয়ের পর এই পরিবারকে খ্রিস্টান বলা হয়। সুতরাং এই পরিবারের রাজীব গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর পরিচয় কীভাবে কৌল ব্রাহ্মণ হতে পারে?

সম্প্রতি রাহুল জওহরলাল নেহরুর গোত্র কৌল (সারস্বত ব্রাহ্মণ) বলে দাবি করে পৈতা ধারণ করেছেন। এটাকে রাজনৈতিক অসততা ছাড়া আর কী বলা যায়। যে লোক রাম এবং রামসেতুর সত্যতা অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু বলে দাবি করছে। মিথ্যার পসরা সাজিয়ে প্রধনমন্ত্রীকে চোর সাব্যস্ত করতে কোমর বেঁধেছে। লন্ডন এবং ইটালিতে এই পরিবারের প্রভূত সম্পত্তি আছে। এই পরিবারের বর্তমান সদস্যরা পরিবারের অন্য সদস্যদের (মেনকা, বরুণ) রাতের অন্ধকারে বাড়িছাড়া করেছে। এই হলো তথাকথিত নেহরু গান্ধী পরিবারেরর ইতিহাস। এই পরিবাবার এবং দলটি অসততার প্রতিরূপ। ■

কংগ্রেসমুক্ত উত্তরপূর্বে প্রবল প্রতিরোধের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা

সাধন কুমার পাল

অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম এই সেভেন সিস্টারসকে এখন যেন চেনাই যায় না। সন্ত্রাসবাদের কলঙ্কে কলঙ্কিত এই সাত বোনের এখন যেন নতুন রূপ। স্বাধীনতার পর এই সাত রাজ্য এখন কংগ্রেস মুক্ত। সেই সঙ্গে শক্তি হারিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও এখন যেন নখদন্তহীন। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস জমানায় টেররিস্ট হাব, ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশি বিদেশি শক্তির প্রয়োগশালা বলে চিহ্নিত উত্তরপূর্ব ভারতকে দেশের মূলস্রোতের অংশ বলে গণ্য করা হতো না। বহু ভাষা, জাতি, গোষ্ঠীতে বিভক্ত উত্তরপূর্ব ভারতে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা অসম্ভব এমনটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৯ সাল থেকে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে উত্তরপূর্ব ভারতে চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল 'অগণিত' বিচ্ছিন্নতাবাদী/সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এদের কারো দাবি সার্বভৌমত্ব আবার কারো স্বায়ত্তশাসন। এদের মধ্যে কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তো সমান্তরাল আন্ডারগ্রাউন্ড সরকার গঠন করে সরকারি করব্যবস্থার মতো কর আদায় করতো। কেউ এই কর দিতে রাজি না হলে তার জন্য অপেক্ষা করতো মৃত্যুদণ্ড।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই সমস্ত রাজ্যগুলির ভূমিপুত্ররা দিল্লি ব্যাঙ্গালোরের মতো শহরে আশ্রয় নিয়েছেন এমন নজির প্রচুর। দেখা যাচ্ছে বিগত চার বছর ধরে উত্তরপূর্ব ভারতে কংগ্রেস যত দুর্বল হয়েছে ততই শক্তি হারিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি। সার্বভৌমত্ব স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের জন্য যে সমস্ত দোকান খোলা হয়েছিল সেগুলির ঝাঁপ বন্ধের মুখে। একই অবস্থা বিদেশি শক্তির মদতপুষ্ঠ টেরোরিস্ট কনসালটেন্সিগুলিরও। ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার সময় উত্তরপূর্বের পাঁচটি রাজ্য-সহ সমগ্র ভারতে ১৩টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। এরপর গত চার বছরে উত্তরপূর্বের পাঁচটি রাজ্য থেকেই কংগ্রেস সমূলে উৎপাটিত। ২০১৬ সালে অসমে বিজেপির কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক পতনের শুরু। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে মিজোরামে পরাজয়ের মাধ্যমে উত্তরপূর্ব ভারতে কংগ্রেসের উৎপাটিত হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ হয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিরোধী শক্তিগুলির ক্রিয়াশীলতার তারতম্য নতুন করে সবাইকে ভাবাচ্ছে। উত্তরপূর্ব ভারতে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভয়মুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে জীবনধারণের গুণগত মানের যে পরিবর্তন এসেছে তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর বিজেপি সরকারের ঘোষিত 'লুক ইস্ট নীতির' সৌজন্যে উত্তরপূর্ব ভারত দেশের মূলস্রোতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দিলেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপূর্ব ভারতের ব্যাপারে কতটা সংবেদনশীল তা স্পষ্ট হবে। চীন ভারত যুদ্ধের ৫৬ বছর পর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩৮ কোটি টাকা অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা জমির মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। এরকম সংবেদনশীলতার অসংখ্য উদাহরণ আছে। ফলে এই সাত রাজ্যের মানুষ দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে যতই একাত্ম বোধ করছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ততই শক্তি হারাচ্ছে।

ইতিহাস বলছে ব্রিটিশ শাসকদের হাত ধরেই ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশের মাধ্যমে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তনের অশুভ প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ফলে স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই বিদেশি ইস্যুতে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি।

ইতিহাস বলছে ব্রিটিশ শাসকদের হাত ধরেই ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশের মাধ্যমে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তনের অশুভ প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ফলে স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই বিদেশি ইস্যুতে বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি। এই নিয়ে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তক্ষয়ও হয়েছে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে অসম চুক্তি স্বাক্ষর হলেও ওই চুক্তি কার্যকর করার মতো ক্ষমতা বা রাজনৈতিক সদিচ্ছা কোনোটাই কংগ্রেস দলে ছিল না। অসমকে কাশ্মীর বানানোর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে বিজেপি ক্ষমতায় এসেই ভোটব্যাঙ্কের দিকে না তাকিয়ে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অব সিটিজেন্স (এন আর সি) নবায়নের মাধ্যমে অসম চুক্তি রূপায়ণের কাজে হাত দিয়েছে।

গত ৩০ জুলাই ২০১৮ এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। সেদিন

অসমের সংবাদপত্রগুলির শিরোনামগুলিতে চোখ বুলিয়ে অসমবাসীর মনটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়ায় বাদ পড়া ৪০,০০,৭০৭ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্তকরণের সংবাদ নানা ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। কোনো কোনো কাগজে ছাপা হয়েছিল এই উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণের ছবিও। সব মিলে সেদিনের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অসম জুড়ে এক উচ্ছ্বাস ও উৎসবের চিত্র ফুটে উঠেছিল। পরিবেশিত সংবাদগুলির ভাষা থেকে প্রকৃত ভাবটি অনুভব করার প্রয়াস করে মনে হলো এদের প্রত্যেকটিতে রয়েছে এক সুদীর্ঘ যন্ত্রণা উপশমের বার্তা। এই উৎসবের বার্তাবাহী সংবাদ প্রতিবেদনগুলির পাশাপাশি চূড়ান্ত খসড়ায় বাদ পড়ে যাদের ঘাড়ের উপর নাগরিকত্ব হারানোর খাঁড়া ঝুলছিল ছাপা হয়েছিল তাদের প্রতিক্রিয়াও। নাগরিকত্ব হারানোর মতো চরম পরিস্থিতিতেও ওই মানুষগুলি যে চলমান ব্যবস্থা ও অসম সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তা থেকে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে এমন সংবাদ চোখে পড়েনি।। সবমিলে এন আর সি-র চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশের পর অসমের মানুষের প্রতিক্রিয়াতে এক অদ্ভুত ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও ভারসাম্য প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী 'অতিসংবেদনশীল' হয়ে গৃহযুদ্ধ বা রক্তপাতের হুমকি দিয়ে বিদ্রোহ উস্কে দেওয়ার নিষ্ফল প্রয়াস করে অসমের মানুষের কাছে নিন্দিত হলেন। নেত্রীর এই ধরণের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য সভাপতি-সহ অন্যান্যরা পদত্যাগ করলেন। ওই রাজ্য থেকে দলটিই অস্তিত্ব শূন্য হয়ে পড়ল।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখার সময় পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে অসমে নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বাঙ্গালিদের রাষ্ট্রহীন করে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে শুধু দেশের ভিতরে নয় কিছু বিদেশি শক্তিও অসমকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে। বছরের পর ধরে অশান্ত অসমকে এন আর সি-পরবর্তী পরিস্থিতিতেও শান্ত দেখে মরিয়া হয়ে উঠছিল উত্তরপূর্বের অশান্তির কারিগররা। গত ১ নভেম্বর হঠাৎ করেই যেন



নেলির গণহত্যা (১৯৮৩)।

ছন্দপতন হলো। অসমের তিনসুকিয়া জেলার খেরবাড়ি এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীর গুলিতে প্রাণ হারালেন পাঁচজন নির্দোষ বঙ্গভাষী মানুষ। ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া প্রাদেশিকতার বিষাক্ত ভাবনায় জারিত বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি যেন আরেকবার মাথা তোলার সুযোগ পেয়ে গেল। বাঙ্গালির স্বঘোষিত ত্রাতা হয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেলেন মমতা ব্যানার্জিও।

ঘড় পোড়া গোরুর মতো উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কা সর্বক্ষণ হিন্দু বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আবার নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি হারিয়ে নিজভূমে পরবাসী হওয়ার আশঙ্কা তাড়িয়ে বেড়ায় অসমীয়া সেন্টিমেন্টকে। বর্তমানে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন (এন আর সি) ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ নিয়ে উদ্বুদ্ধ জটিল পরিস্থিতিতে অসমে 'অসমীয়া সেন্টিমেন্টকে' ও পশ্চিমবঙ্গে 'বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট' উস্কে দিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়াটি ভেস্তে দিতে দেশ বিরোধী শক্তি সক্রিয় হবে না কল্পনা করাও যায় না। আবার ঘোলা জলে মাছ ধরতে রাজনীতির কারবারিরা মাঠে নামবেন না এটাও ভাবা যায় না। বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে যে স্বাধীনোত্তর ভারতে যদি সস্তা সেন্টিমেন্ট ও তোষণের রাজনীতি না হতো তাহলে আজ এন আর সি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের কোনো প্রয়োজনই থাকতো না। অসমের অস্থিরতা রাজনৈতিক কলহ-জাত এরকম ভাবলে ভুল হবে। অসমকে নিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে শাসক ইংরেজ ও মুসলিম লিগের পরিকল্পনা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্ষমতালোভী কংগ্রেসের আত্মঘাতী নীতির উপর আলোকপাত করতে হবে।

ইংরেজ শাসনের সময় থেকে ধরলে অসম সমস্যার সূত্রপাত দু'শো বছর আগে। ১৮২৬ সাল থেকে অসমে ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন হয়। সুবিধের জন্য ইংরেজরা এই সমস্ত এলাকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে বরাবরই ইংরেজি জানা বাংলাভাষীদেরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। শাসন ও শোষণই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের মূলমন্ত্র। রাজস্ব আদায় ছাড়া স্থানীয় ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে এলাকার উন্নয়নের দায় ইংরেজ শাসকদের ছিল না। ইংরেজ জামানায় সমগ্র উত্তরপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনের মুখ হিসেবে বঙ্গভাষীদের সঙ্গে অসমের স্থানীয় মানুষদের বৈরীতার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। ইতিহাস বলছে এভাবেই দানা বাধতে থাকে 'অসম সেন্টিমেন্ট' নামক স্পর্শকাতর ইস্যু। ১৮৩৭ সালে অসমিয়া ভাষাকে সরিয়ে বাংলাকে অসমের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অসমিয়াকে চিহ্নিত করা হয় বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে। সে সময় অসমের জনসংখ্যা কম হওয়ার জন্য রাজস্ব আদায় হতো খুবই কম। এই যুক্তিতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অঙ্গ হিসেবে ছিল ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি বাংলাভাষী জেলাকে

ঢাকা ডিভিশন থেকে কেটে, অসমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো। ফলে অসম একটি বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ সরকার বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার চাষিদের অসমের পতিত জমিতে পূর্বাসন নীতি চালু করলে ভূমিহীন মুসলমানরা ব্যাপক হারে অসমমুখী হতে থাকে। অসমীয়া মানুষের প্রতিরোধ সত্ত্বেও বাংলাভাষী মুসলমানরা দলে দলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। যে রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা হিসেবের মধ্যে আসতো না সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯০১ সালে এড্রু ফ্রেজার বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। ১৯০৩ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গের খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়ায় পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন হ্রাস করার প্রস্তাব দেন। লর্ড কার্জনের অনুমোদন পাওয়ার পর লন্ডনে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এবং এই নবগঠিত প্রদেশটির নাম হবে পূর্ববঙ্গ অসম। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে দেখে লর্ড কার্জন জনমত সংগ্রহের জন্য পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার অতিথি হলেন। শলাপরামর্শ করে ঠিক হলো পদ্মাপারে একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশ গঠন করা হবে। যার রাজধানী হবে ঢাকা। এই সময় ঢাকায় আয়োজিত বিশাল মুসলমান জনসভায় কার্জন তার ভাষণে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের মুসলমান জাগরণ, প্রাচীন সুলতান ও সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য বঞ্চিত, সে জন্য তাদের ঐক্য ফিরিয়ে দিতে হবে।'

গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫ অনুসারে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে অসমে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। এই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়ী হয়েও কংগ্রেস সরকার গঠনে অস্বীকার করে। এরপর অসমের গভর্নর মহম্মদ সৈদুল্লার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য ডাকেন। ১ এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, ১৭ নভেম্বর ১৯৩৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ এবং ২৪ আগস্ট ১৯৪২ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সৈদুল্লা অসমের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে সৈদুল্লা সরকার অসমের পতিত জমিতে বাংলাভাষী মুসলমানদের পুনর্বাসন দেওয়ার নীতি ঘোষণা করেন। সে সময় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট অসমে পতিত জমিতে আরও বেশি করে খাদশস্য উৎপাদনের জন্যই এই পুনর্বাসন নীতি নেওয়া হয়েছে। ভাইসরয় খোদ লর্ড ওয়াভেল এই 'গ্রো মোর ফুড' স্লোগানকে 'গ্রো মোর মুসলিম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের কার্যকরী সদস্য হিসেবে মহম্মদ সৈদুল্লা ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাবের খসড়া তৈরিতে অংশ নিয়েছিলেন। এহেন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সম্পন্ন সৈদুল্লা ১৯৪৭-এ ভারতের সংবিধান পরিষদের সদস্য হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৪০ সালে লাহোর চুক্তিতে পাকিস্তান প্রস্তাবে অসমকেও পাকিস্তানের অঙ্গ করে নেওয়ার প্রস্তাব উঠল। এই সমস্ত ঘটনাক্রম থেকে এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তিশালী এবং খুশি করার জন্য অসমকে মুসলমান বহুল রাজ্যে পরিণত করার বিষয়টি ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির অঙ্গ। অসম পাকিস্তানে গেলে অসমিয়াদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষাগত বৈশিষ্ট রক্ষা সম্ভব নয়। এই আতঙ্কে অসমিয়াদের মধ্যে ভাসতে থাকে ইসলামিক আগ্রাসন নিয়ে আতঙ্ক সেই সঙ্গে ক্ষোভও। এই ক্ষোভ ও আতঙ্ক যে এক সময় বাঙ্গালি বিদ্বেষের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে থাকে।

দেশভাগের সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে কোনো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা থাকলে তার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য গণ ভোটের দাবি উঠেনি। একমাত্র ব্যাতিক্রম সিলেট জেলা। জিন্নাপন্থীরা দাবি তুললেন সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট নিতে হবে। অসমের তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই দাবি মেনে নিলেন। ঠিক হয় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই গণভোট হবে। এই ভোট কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের গুণ্ডরা দাঙ্গা বাধিয়ে এমন ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করল যে ভারতের পক্ষের ভোটদাতারা পোলিং স্টেশনেই পৌঁছতেই পারলেন না। ভোটের দুই দিন সমগ্র সিলেট জুড়ে মুসলমান গুণ্ডারা অবাধ রাজত্ব চাললেও কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলুইয়ের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন ছিল নির্বাক দর্শক। সিলেটের দুই লক্ষ চা শ্রমিক যারা অসম বিধান পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে তাদের ভোট দান থেকে বঞ্চিত রাখার দাবিও মেনে নেওয়া হলো। এক্ষেত্রে মুসলিম লিগের যুক্তি ছিল যে চা শ্রমিকরা ভাসমান নাগরিক সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের ভূমিকা থাকতে পারে না। সেদিনের সেই প্রহসনের গণভোটে ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে সিলেট পাকিস্তানে চলে গেল। সিলেটের পার্শ্ববর্তী জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাছারে তখন মুসলমান গুণ্ডাদের বলতে শোনা যেত 'সিলেট নিলাম গণভোটে, কাছাড় নিমু লাঠির চোটে।'

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অসমবাসীর মন রাখতে অসমকে বাঙ্গালি আগ্রাসনের (পড়ুন ইসলামিক আগ্রাসনের) হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস নেতারা বর্তমান ত্রিপুরার চেয়ে আয়তনে বড়ো সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্তে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যে কংগ্রেস নেতরা গণভোটে সায় দিয়ে প্রহসনের ভোটে সিলেটকে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে মদত জুগিয়ে ছিলেন দেশভাগের পর ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সেই কংগ্রেস নেতাদের বঙ্গভাষী মুসলমানদের অসমমুখী করার নীতি প্রমাণ করে যে অসমকে বঙ্গভাষীদের প্রভাব মুক্ত করতে নয় মুসলিম লিগের আবদার মেনে ইংরেজ শাসকদের শক্তিশালী ইসলামিস্থান অর্থাৎ পাকিস্তান গড়ার পরিকল্পনায় মদত জোগাতেই সিলেটকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার সংক্রান্তে শামিল হয়েছিলেন। সেই সময় সিলেটে হিন্দু মুসলমান সমান সমান ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই সিলেট পাকিস্তানে যাওয়র পর আবার উদ্বাস্তুর ঢল নামে। কংগ্রেস নেতাদের এই ভুলের জন্য ভারতকে ভূমিও হারাতে হলো আবার উদ্বাস্তুর বোঝাও বইতে হলো। এত বড়ো ঐতিহাসিক ভুল সত্ত্বেও স্বাধীনোত্তর ভারতে অসমের ক্ষমতার রাশ কংগ্রেসের হাতেই থেকে যায়। ফলে আবার ঘটতে থাকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের অসমে আশ্রয় দেওয়ার মতো ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি, সেই সঙ্গে চলতে থাকে ইসলামিক ও খ্রিস্টান মিশনারীদের পোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয়ের হীন রাজনীতিও। ২০১৬ সালে অসমে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতার সাতদশক পর প্রথমবার কংগ্রেস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি এখন প্রবল প্রতিরোধের মুখে। ■



জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লাগামহীন মিথ্যাচার আর কবে বন্ধ হবে?

বরুণ দাস

রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের মানুষকে ভুল বোঝানো কিংবা বিভ্রান্ত করা এদেশের রাজনীতিকদের প্রধান প্রবণতা। এই সস্তা ও চটকদারি প্রবণতা সাময়িক কাজ দিলেও আখেরে দেশ ও দশের কোনও মঙ্গল হয় না। একথা যে চতুর রাজনীতিকরা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ দেশের স্বার্থের থেকেও তাঁদের কাছে বড়ো। ফলে মাছি যেমন পচা ঘায়ের দিকে ভন ভন করে, তেমনি রাজনীতিকেরাও মিথ্যে ও ভুল বিষয়গুলি নিয়ে আম-জনতাকে বিভ্রান্ত করতে বরাবর তৎপর।

এর জ্বলন্ত উদাহরণ জিএসটি বা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স। বাংলায় যাকে পণ্য ও পরিষেবা কর বলা হয়। অনেকেই জানেন, এটি ভাজপা নিয়ন্ত্রিত এনডিএ সরকার লাগু করলেও এর পরিকল্পনা করা হয় কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ আমলে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিংহ তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ও (পরে রাষ্ট্রপতি) এর সমর্থনে সওয়াল করেছিলেন। এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এসে বিষয়টি ফেলে না রেখে তড়িঘড়ি বাস্তবায়িত করেন।

জিএসটি লাগু হয়েছে বছর ঘুরতে চললো। যখন এটি সারা দেশে লাগু হয়, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত থেকেই বিরোধীদের সম্মিলিত প্রতিবাদে মুখর ভারতের রাজনীতি। তাঁদের প্রচারের সারমর্ম হলো জিএসটি দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। শুরু থেকেই তাঁরা একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার বিষোদগার করে চলেছেন। জিএসটি দেশের সাধারণ ক্রেতাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে— এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচার গড়ে তুলেছেন বিরোধীরা।

যাঁরা জিএসটি-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব, তাঁদের অন্যতম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। জিএসটি কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ড. মিত্র। যাঁদের সুপারিশ জিএসটি বলবৎ হয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম অংশীদার। দিল্লিতে জিএসটি-র বৈঠকে সায় দিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই নেত্রীর নির্দেশে ড. অমিত মিত্র জিএসটি-র বিরুদ্ধে সরব। এই রাজনৈতিক ভণ্ডামী ও সীমাহীন দ্বিচারিতা মানুষ কতোদিন মেনে নেবেন?

দেশের প্রায় অর্ধেকের বেশি রাজ্য জিএসটি আইন প্রণয়নে সায় দিয়েছে। এজন্য, সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। এটি হলো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ে দেশের প্রথম পরীক্ষা। ফলে শুরুতে সামান্য পরিকাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। কিন্তু সেটাকেই বড়ো করে তুলে ধরে বিরোধিতা করাটা ঠিক নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের তামাম বিরোধীপক্ষ নিজেদের গঠনমূলক ভূমিকা ভুলে জিএসটি বিরোধিতায় নেমেছেন। দেশের মানুষকে অত্যন্ত সচেতনভাবে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

অথচ জিএসটি চালু হওয়ায় রাজ্যের লাভ। ক্রেতা-সাধারণেরও লাভ। কীভাবে? 'নুন আনতে পান্তা ফুরনো' রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায়ও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। ফলে লাভবান হবেন রাজ্য সরকারও। রাজ্যের শূন্য রাজকোষে অর্থের জোগান বাড়বে। এর ফলে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে। অর্থের অভাবে আটকে থাকা প্রয়োজনীয় সরকারি প্রকল্পগুলি জনস্বার্থে বাস্তবায়িত হবে। উপকৃত হবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। কারণ রাজস্ব ঘাটতি হলে উন্নয়ন ব্যহত হয় একথা আমরা সবাই জানি।

যাঁরা জিএসটি-র জন্মদাতা, সেই কংগ্রেসের জিএসটি-বিরোধিতা আমাদের অবাক করে। তাঁদের অভিযোগ, উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি না করেই জিএসটি লাগু করা উচিত হয়নি। অভিযোগের আংশিক যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ উপযুক্ত পরিকাঠামো যে তৈরি হয়নি, তা প্রথমদিকে টের পাচ্ছিলেন জিএসটি প্রদানকারী অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের ব্যবসায়ী মহল। সরকারও মেনে নিয়েছেন তা। কিন্তু বছর ঘুরতেই পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে। প্রথমদিকের জট-জটিলতা প্রথম অনেকটাই উধাও।

আমাদের অবাক করে জিএসটি নিয়ে দেশের প্রধান বিরোধীদল



জাতীয় কংগ্রেসের অযৌক্তিক দাবি। কী সেই অযৌক্তিক দাবি? রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস মনে করে জিএসটি-তে একটিই মাত্র করের হার রাখা উচিত। এমন অযৌক্তিক দাবিতে তাজ্জব সবাই। কারণ বিলাস-দ্রব্যে চাপানো করের হারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের করের হার কখনও এক হতে পারে না। দামী গাড়ির করের হার কি কখনও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাপানো করের হারের সমান করা উচিত?

কংগ্রেসের বিরোধিতা কোনও যুক্তিতেই মানা যায় না। তাঁরাই বা কেন উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেননি দশ বছরের শাসনে? আর 'উপযুক্ত পরিকাঠামো'র অভাব দেখিয়ে জিএসটি-র মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বছরের পর বছর ফেলে রাখা কোনও দায়িত্বশীল সরকারের কাজ হতে পারে না। তাঁরা কি নাকে তেল দিয়ে গোটা একটি দশক ঘুমুচ্ছিলেন? ক্রেতাস্বার্থে তাঁদেরই পরিকল্পিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যদি অন্য সরকার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে তো অকারণ বিরোধিতা করতে হবে?

এ কোন ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন নোংরা রাজনীতি? দলের স্বার্থ না দেশ ও দশের স্বার্থ কোনটা প্রাধান্য পাবে রাজনৈতিক দলের কাছে? আর কবে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা সাবালক হবেন? সংকীর্ণতা, নীচতা, দীনতা, ভণ্ডামীকে দূরে সরিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ন্যূনতম স্বার্থের কথা চিন্তাভাবনায় আনবেন? যাঁদের নিয়ে ভোটের রাজনীতি করেন, প্রাধান্য দেবেন তাঁদের স্বার্থকে? তাঁরা কি লক্ষ্য করেছেন, কেন প্রতি ভোটের সময় ইভিএম মেশিনে নোটার দিকে পাল্লা ভারী হচ্ছে?

জিএসটি নিয়ে দেশের মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজ এখনও চলছে! ব্যবসায়ী মহলও এতে সচেতনভাবেই ইন্ধন দিচ্ছেন। তারা ইচ্ছে মতো বিক্রিত পণ্যের দাম বাড়িয়ে তার দায় ঠেলে দিচ্ছেন জিএসটি-র ঘাড়ে। অর্থাৎ জিএসটি-র জন্যেই এতো দাম দিতে হচ্ছে ক্রেতাকে! একদিকে বিরোধীদলের সুচতুর প্রচার, অন্যদিকে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মহলের বিষোদগার। দুয়ে মিলে সাধারণ ক্রেতারা বিভ্রান্ত, বুঝি বা দিশেহারাও! কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা এই সুযোগটাই অনৈতিকভাবে নিচ্ছেন এ দেশের সুবিধাবাদী বিরোধীপক্ষ।

উল্লেখ্য, যাঁরা কর-সংক্রান্ত সামান্য খোঁজ খবর রাখেন কিংবা শিক্ষিত ও সচেতন ক্রেতা, তাঁরা সবাই কমবেশি জানেন, জিএসটি লাগুর আগে বহু পণ্যের ওপরই অত্যধিক হারে কর নেওয়া হতো। রাজস্ব সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, পরোক্ষ করের গড় হার ছিল ৩১ শতাংশ। জিএসটি শুরু হবার পর সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে কিছু পণ্যপরিষেবাকে ২৮ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ বন্ধনীতে রাখলেও কর আদায় বৃদ্ধি পাওয়ার পর পরই ওই কর (২৮ ও ১৮ শতাংশ) কমানো হয়েছে।

ফলে জিএসটির পর বেশির ভাগ পণ্যের কর অনেকটাই কমেছে এবং ক্রেতা-সাধারণ আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য-পরিষেবা পাচ্ছেন। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, জিএসটি আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে— তা আশাতিরিক্ত। দেখা গেছে, দেশে ২০১৭ সালের পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি শুরু হলেও ২০১৫-১৬ সালে রাজ্যগুলির প্রকৃত কর আদায়ের ওপর বার্ষিক ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি হিসেব করে ওই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ফলে রাজ্যগুলির কর আদায় প্রতি বছর ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

৬টি রাজ্য ওই লক্ষ্যমাত্রা পার করেছে; ৭টি রাজ্য তাদের লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি এবং কেবল ১৮টি রাজ্য তাদের লক্ষ্যমাত্রার থেকে ১০ শতাংশের বেশি দূরে। ফলে রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন গত বছরের তুলনায় এ বছর অনেক কম হবে। আর ২০১৮-র প্রথম ৬ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি আদায় গত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৭-তে জিএসটি আদায় হয়েছে প্রতিমাসে গড়ে ৮৯,৭০০ কোটি টাকা। ২০১৮-এর সেই অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ৯৭,১০০ কোটি টাকা।

একমাত্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থেই বিরোধীরা জেনে শুনেও ডাহা মিথ্যেকথা প্রচার করে চলেছেন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সত্যি কথা বলার সৎসাহস এদের নেই। যদিও মিথ্যে বলার অনৈতিক অধিকার এঁরা কায়েম করে নিয়েছেন। অথচ কেন্দ্র ও প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধিত্বে নতুন পরোক্ষ কর ব্যবস্থার নীতি-নির্ধারক সংস্থা জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একতরফা ভাবে এটি লাগু করেননি। যদিও বিরোধীরা জিএসটি-র যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাতে ব্যস্ত।

জিএসটি আইনের খসড়া রচনা থেকে শুরু করে যাবতীয় বিধি তৈরি, বিজ্ঞপ্তি জারি, প্রাথমিক কর হার চূড়ান্ত করা, পরবর্তীকালে সেই কর হার সরল করা— এমন হাজারও সিদ্ধান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জানান, 'জিএসটি কাউন্সিলের বাইরে যতোটা রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা যায়, কাউন্সিলের মধ্যে ঐকমত্য ততোটাই।' বুঝুন ঠ্যালা। কতোটা ভণ্ডামি আর দ্বিচারিতা নিয়ে এরা রাজনীতি করছে দলগুলি।

জিএসটি-র কাঠামোতে দেখা গেছে, ১৮৩টি পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে করের হার শূন্য। ৩০৮টির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। ১৭৮টির ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ। ৫১৭টির ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ। আর মাত্র ২৭টি বিলাসদ্রব্য ও নেশার পণ্যের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ। সিমেন্ট ও গাড়ির যন্ত্রাংশ এই কর বন্ধনীতে থাকলেও তা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবার পাঠক আপনিই বিচার করুন, জিএসটি লাগু হওয়ায় কার লাভ হয়েছে। উল্লেখ্য, ১২ ও ১৮ শতাংশ এই দুই পৃথক হারের পরিবর্তে একটি কর হার প্রণয়ন করার সিদ্ধান্তও পাকা।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহলও ক্রমশ অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন জিএসটি নামক এই নতুন কর প্রদান ব্যবস্থায়। আধুনিক ও সহজ ধরনের সফটওয়ারও এসেছে বাজারে। যার ফলে কর প্রদানের ডিজিটাল হিসেবের পদ্ধতিতে জট-জটিলতা অনেকটাই কমেছে। আগামী দিনে আরও সহজ হবে এমন আশা করাই যায়। আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে। একদিন বিরোধীদের মিথ্যে প্রচারও ভোঁতা হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবেন বিরোধীদের প্রচারের অসারতা। সেদিন কিন্তু আর খুব বেশি দূরে নয়। ■

মুসলিম লিগ কবে থেকে ধর্মনিরপেক্ষ হলো

দেশ ভাগের পূর্বে ১৯৪৬-এর দুটো প্রচারপত্রের কথা মনে পড়ছে। প্রথমটাতে একপাশে তরবারি হাতে জিন্নার ছবি, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক। তাতে লেখা আছে, ''স্বর্গেও ইসলামের তরবারি সূর্যকিরণের ন্যায় জ্বল জ্বল করবে, ইসলামের বিরুদ্ধে সব অশুভ শক্তিকে নস্যাৎ করবে। আমরা মুসলমানরা রাজমুকুট পরে দেশ শাসন করেছি। অতএব হে মুসলমান ভাইরা, উৎসাহ হারিয়ো না প্রস্তুত হও, অস্ত্র হাতে তুলে নাও, একবার ভেবে দেখ, আজ আমরা কাফেরদের অধীন...হে কাফেরগণ, সুখ বা গর্ব অনুভব করো না, তোমাদের শেষ বিচার দূরে নয়। তোমাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারি দ্বারা তোমাদের জয় করবো...হে মুসলমানগণ, যারা গুন্ডা, চরিত্রহীন, বেনামাজী, তারাও এসো, তোমাদের জন্য বেহেস্তে দরজা খোলা আছে, চলো আমরা সেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে প্রবেশ করি। এসো পাকিস্তান আদায়ের জন্য, মুসলমান জাতির জয়ের জন্য যেসব সেনারা জেহাদে শুরু করেছে, আমরাও তাদের সঙ্গী হয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি।'' এছাড়াও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্বে মুসলিম লিগ যে প্রচারপত্র বিলি করে তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো—

(১) পাকিস্তান জয়ের পর সারা ভারত জয় করতে হবে। (২) ভারতের সব মানুষকেই ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে। (৩) হিন্দুর যত কারখানা ও দোকান আছে তা ধ্বংস করতে হবে এবং লুঠ করতে হবে এবং লুঠের মাল লিগ অফিসে জমা করতে হবে। (৪) মুসলিম লিগের সব সদস্যদের অস্ত্র বহন করতে হবে এমনকী দরকার হলে পকেটে রাখার মতো ছোরা ব্যবহার করবে যাতে ভারতবর্ষ থেকে থেকে সমস্ত হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়। (৫) সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা লিগের সঙ্গে যুক্ত নেই তাদেরকে গুপ্তভাবে হত্যা করতে হবে। (৬) হিন্দুদের ক্রমাগতভাবে খুন করে যেতে হবে এবং তাদের সংখ্যা কমাতে হবে। (৭) সমস্ত মন্দির ধ্বংস করতে হবে। (৮) প্রতি মাসে একজন কংগ্রেস নেতাকে খুন করতে হবে। (৯) হিন্দুনারী ও মেয়েদের ধর্ষণ করবে, লুঠ করবে ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করবে ১৮ অক্টোবর ১৯৪৬ থেকে।

১৯৪৮-এর ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার রমনা রেস কোর্স ময়দানে কায়েদে জিন্নার জন্মদিন পালিত হয়। এই ট্র্যাডিশন এখনও বজায় আছে। উপস্থিত ছিলেন লিগ মন্ত্রীসভার সদস্য এবং প্রথম সারির লিগ নেতারা এবং দশ হাজার সাধারণ মানুষ। জিন্নার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আরম্ভ হয় হিন্দু বিদ্বেষী তথা ভারত বিদ্বেষী বক্তৃতার প্রতিযোগিতা। বক্তৃতার শেষে জিন্নার নামে শপথ নিয়ে বলা হয়, ''হে মুসলমান ভাইরা, যদিও তিনি আমাদের এতিম (অনাথ) করে দিয়ে বেহস্তে চলে গেছেন কিন্তু আজ তার এই জন্মদিনে অখণ্ড বাংলাকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্নকে পূর্ণ করার জন্য আমরা খোদার বান্দা প্রতিটি মুসলমান জেহাদ চালানোর শপথ নেব। যদি সমস্ত বাংলা নাও পাই তবে গঙ্গার পূর্বতীর পর্যন্ত এবং জিন্না সাহেবের স্বপ্নের কলকাতাকে আমরা আমাদের করে নেবই। আল্লার দরবারে এখন আমরা কায়েদ-এ-আজমের এই স্বপ্নপূরণ করার জন্য মোনাজাত করবো।'' জুন ১৯৪৭ মুসলিম লিগ নেতা ফিরোজ খাঁ নুন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন ব্রিটিশরা যদি আমাদের কাফের (হিন্দু) রাজত্বের অধীন করে দিয়ে যায় তো আমরা ব্রিটিশকে জানিয়ে রাখছি এ দেশের মুসলমানরা এমন ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করবে যা চেঙ্গিজ খানের কীর্তিকে নিষ্প্রভ করে দেবে। এই মুসলিম লিগ হলো সেকুলার এবং বিজেপি সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজদের দল! এখন পশ্চিমবঙ্গে যেসব সেকুলারবাদী মুসলমান নেতা সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করে চলেছে, দেশভাগের প্রাক্কালে তাদের আব্বা চাচাদের কী ভূমিকা ছিল একবার অনুসন্ধান করে দেখবেন কি? যেমন তৃণমূল এমএলএ ড. এম নুরুজ্জামান মুসলিম লিগ নেতা হাসানুজ্জামানের ছেলে।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।

চিঠিপত্র

গেরুয়াকে এত ভয় কেন?

গেরুয়া, সেফরন, গৈরিকিকরণ এই কথাগুলি বিগত দশ বছর যাবৎ বহুচর্চিত। পত্রপত্রিকায় ও সংবাদমাধ্যমে। গেরুয়া পছন্দকারীদের বা গেরুয়াধারীদের এই বিষয়ের দিকে যত না গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব গেরুয়া অপছন্দকারীদের। ভারতবর্ষ মানেই হচ্ছে গেরুয়া এবং ভারতবাসীর মনের অন্তরে সর্বদাই গেরুয়াই বিরাজিত। গেরুয়া রঙটি মূলত ত্যাগের প্রতীক। আত্মত্যাগের মাধ্যমে পরের কল্যাণেই হলো গেরুয়াধারী বা গেরুয়াকারীদের পছন্দের। স্বামী বিকেকানন্দ বলেছেন ভারতের কল্যাণ হওয়া মানেই বিশ্বের কল্যাণ হওয়া। তিনি বলেছেন ভারত শুধু ভারতের জন্য বেঁচে থাকবে না বেঁচে থাকবে জগতের জন্য। গেরুয়া মানে ত্যাগ সততা ভালোবাসা, এই সম্পদের গুরুত্ব--- ভোগ সর্বস্ব আত্মস্বার্থপরায়ণ আকারে মানুষ হলেও যাদের চিন্তাভাবনা পশুপ্রবৃত্তির তারাই গেরুয়ার বিরোধী। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন ''ভারতের রাজন্যবর্গ গেরুয়াকে খুব ভয় পায় কারণ পাছে আবার শিবাজী মহারাজের মতো একজন গেরুয়া পছন্দকারী রাজনেতা হয়ে ওঠে।'' ভোরের রবির প্রকাশ গেরুয়া রঙের মধ্য দিয়ে জগৎকল্যাণের জন্য। এই গেরুয়ার বিরোধীরা, তার বিরোধিতা করে মনে প্রাণে অন্ধকার রজনী অপবিত্রতায় নিজেরা নিমজ্জিত। তাই গেরুয়া তাদের পছন্দ নয়। এবার আসি আগুনের কথা। যার রঙ গেরুয়া

সে নিজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এই গেরুয়া বিরোধীরা কি গেরুয়া রংয়ের বিরোধী হয়ে সমস্ত কিছু কাঁচা খাদ্য ভক্ষণ করতে চায়? ফিরে যেতে চায় আদিম যুগে? তা যাক, তাদের আদিমতা পশুত্ব পছন্দ বলেই গেরুয়াকে এত ভয়।

সর্বোপরি এ দেশের সাধু সন্ন্যাসীর পোশাকের রঙ হলো গেরুয়া। এই গেরুয়া পোশাক তারা সাধনবলে লাভ করে। হঠাৎ করে দোকান থেকে কিনে পরেন না। এই গেরুয়া পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শাস্ত্রমতে তারা নিজেদের শ্রাদ্ধ নিজেরাই দেয় সূর্যকে সাক্ষী রেখে এবং পূর্বাশ্রমের নাম গোত্র সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেয়। স্বাভাবিক ভাবে বোঝা যায় গেরুয়ার গুরুত্ব কত অপরিসীম। তাই শুধু দেশে নয় শুধু শিক্ষায় নয়, মানুষের মনও গেরুয়াময় হোক এবং আসুন সবাই আমরা গেরুয়ার সন্নিধানে প্রকৃত মানবজীবনের উদ্দেশ্য লাভের পথে ধীরে ধীরে এগোই। স্বামী বিবেকানন্দ গেরুয়া পোশাক পরেই বিশ্বজয় করেছিলেন তার সেই বিশ্বজয়কে স্মরণ রেখে তারই নির্দেশিত ভারত এবং ভারতবাসী এগিয়ে চলুক এবং সারাদেশ গেরুয়াময় হয়ে উঠুক যেখানে থাকবে অপরের প্রতি ভালোবাসা আর্তের প্রতি সেবা। পশু মানুষ থেকে মানুষ, মানুষ থেকে দেব মানুষের পথে উন্নীত হওয়ার একমাত্র রাস্তা হলো গেরুয়ার সন্ধান। তবে হ্যাঁ চোরা ধর্মের কাহিনি যেমন শোনেন না। স্বার্থপর ঠকবাজী এবং অপরের ক্ষতি করেও যারা নিজের সুখে থাকার স্বপ্ন দেখে তারাই গেরুয়ার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন করছেন। আগামীদিনেও করবেন। কিন্তু এতে তারাই পুড়বেন গেরুয়ার তীব্র আলোক জ্যোতিতে। কারণ ভারতবর্ষতে গেরুয়ারাজ ছিল আছে থাকবে।

—মদনমোহন সিংহ,
ডুমরজলা, হাওড়া।

দেশের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিবিধের মাঝে মিলনের দেশ ভারত। এই মহান দেশের দর্শন অহিংসা। এই অহিংসাই বিশ্বশান্তির দিশারি। সেই অহিংসার দেশে সকল বর্গের গরিবের সংরক্ষণ ছিল, কিন্তু উচ্চবর্ণের গরিবদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সেদিকটি ছিল মানবতার পরিপন্থী। এই ব্রাত্য গরিবদের দশ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে মোদিজী মানবিকতারই পরিচয় রেখেছেন।

ভারত দ্বিজাতিতত্ত্বে দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু হিংসার পরিসমাপ্তি না ঘটে আরও প্রজ্বলিত হয়েছে। অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানকে দিতে চাওয়া হচ্ছে। আরও খণ্ডিত করার চক্রান্ত করা হচ্ছে, কিন্তু অন্যেরা নীরব থাকলেও মোদীজী সোচ্চার। নেতাজী সুভাষের প্রতিচ্ছবি আজ মোদীজীর ছবিতে দৃশ্যমান। দুর্নীতি দমনে মোদীজী আব্রাহাম লিঙ্কনের দাসপ্রথা নিবারণের সমপর্যায়ে তুলনীয়।

দেশের মহান ব্যক্তিত্ব যাঁরা বিশ্বে ভারতকে সাহিত্যে, সংগীতে ও বিভিন্ন দিক থেকে উচ্চে তুলে ধরেছেন তাঁদের 'ভারতরত্ন' উপাধি দান করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রীর পরিচয় রেখেছেন নামদার না হয়েও অর্থাৎ কামদার। গরিব মানুষের সন্তান তিনি, গরিব মানুষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। মোদীজী গরিব মানুষদের গর্ব একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবেরহাট, কোচবিহার।

বামেদের নেতাজী প্রীতি!

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষত ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে বামফ্রন্টের নেতাজীর জন্মদিন পালনে উৎসাহের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিবসকে 'দেশপ্রেম দিবস' এবং ওইদিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। বামফ্রন্টের নেতাজী বিষয়ক দুটো দাবিকে নৈতিকভাবে সমর্থন জানিয়ে বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখছি। অতীত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ, এইচ ডি দেবেগৌড়া, ইন্দ্রকুমার গুজরাল— এই তিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের সুসম্পর্ক ছিল। যদিও এঁরা কেউই কার্যকালের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। আপনারা ওই তিন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে 'বন্ধু সরকার' সম্বোধনে অভিহিত করতেন। সেই সময় আপনারা নেতাজী বিষয়ক দাবি আদায়ে সচেষ্ট বা সফল হননি কেন? স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৫১ জন) বামপন্থী সাংসদ, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য ছিলেন। সেইসব সাংসদদের সংসদে নেতাজীর দাবির বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে শোনা যায়নি। ইউপিএ-১ সরকার (২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল)-কে আপনারা বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রাণভোমরা ছিলেন আপনারা। তখন তো অনায়াসে 'দেশপ্রেম দিবস' ও জাতীয় ছুটির দাবি আদায় করতে সমর্থ হতেন। ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকসভায় তিনজন এবং রাজ্যসভায় ১ জন সদস্য ছিলেন। উপরোক্ত দাবি আদায়ে তাদেরই বা কী সদর্থক ভূমিকা ছিল? প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৯-২০০৪) ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনিও তাঁর এই সম্পর্কের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হননি।

বামফ্রন্টের যখন সুদিন (১৯৭৭ থেকে ২০১১) ছিল, তখন আপনারা নেতাজীকে নিয়ে জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেননি। আর বর্তমানে তো আপনারা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। কে শুনবে আপনাদের কথা?

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
৫৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯



কবিতার মতো জীবনও ঘষামাজায় উজ্জ্বল হয়

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

"সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারিপাশ।..."

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেন এক নারী সমুদ্রজলে স্নান সমাপন করে বালুকাবেলায় বসে রয়েছে। তিরধনুক নিয়ে এক রাজবেশী পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—তোমার দ্বারে এসেছি।

কিন্তু পুরো কবিতাটিই রূপক। সাগরজলে বেষ্টিত দ্বীপ শ্যামদেশ অর্থাৎ এখনকার থাইল্যান্ডকে কবি বলছেন, অতীতে আমার পূর্বপুরুষরা বারংবার এদেশে এসেছেন। তাঁরা কেউ রাজা ছিলেন, কেউ বণিক। সেই একই দেশ ভারতবর্ষ থেকে আমি তোমার দ্বারে এসেছি, রাজ্য জয় করতে নয়, বাণিজ্য করতে নয়, এসেছি সংগীতের মূর্চ্ছনায় তোমাকে প্লাবিত করতে। —"দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না।"

কী অনবদ্য রচনা! পড়লে বিস্ময় জাগে। রবীন্দ্র-রচনা তো বারংবার আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করেছে, আজও করে, ভবিষ্যতেও করবে। এ কবিতাটি প্রথম রচনার সময় কবি লিখেছিলেন :

"সেদিন শুভক্ষণে
অরুণ আলো বলিতেছিল নারিকেলের বনে,
সাগরজলে সিনান করি..."

পরে প্রথম চরণদুটি কবিতা থেকে পরিত্যক্ত হয়। পুনরায় আমাদের বিস্ময় জাগে। রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকেও তাঁর রচনা চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে সংশোধন করতে হয়?

"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা/ মম শূন্যগগনবিহারী,/আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—" সংগীতটি প্রথম খসড়ায় লিখেছিলেন :

"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগন বিহারী।"...

পরে সংশোধন করে পরিবর্তিত এই অপূর্ব সুন্দর রূপ দেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যে কোনও সৃষ্টির মধ্যেই আছে নির্মাণের এক বড়ো ভূমিকা/ 'কুবলা খান'-এর মতো স্বপ্নে-পাওয়া কবিতাতেও কোলরিজকে নিশ্চয় সাহায্য করেছিল তাঁর ছন্দনির্মাণের, তাঁর বাক্য নির্মাণের পুরোনো অভিজ্ঞতা।" এই রচনা দুটির মতো অধিকাংশ কাব্যে হয়তো কবি সচেতনভাবে নিজের লেখা মুছেছেন, আবার লিখেছেন নতুন করে; করে তুলেছেন সৃষ্টিকে অনবদ্য।

জীবনকেও কী এমনই মার্জনা করে করে সুন্দর করে তুলতে হয়? যাঁদের জীবনযাপন আমাদের মুগ্ধ করে তাঁরা কী নিবিড় সংযমে জীবন থেকে স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ ও অহমিকা বাদ দেন না? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমার দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি
দান,
আমি গাই গান।"

পাখির গান তার সহজাত, মানুষকে নিরন্তর সাধনায় স্বরযন্ত্রকে সংগীতের উপযুক্ত করে তুলতে হয়। যে পারে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে এক অপরূপ সংগীত। না পারলে দেবতার মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে সে বলে

"ক্ষমা করো, আমি পারিনি।
দরজা খুঁজে পাইনি রাজবাড়ির,
সিঁড়ি খুঁজে পাইনি মন্দিরের,
ক্ষমা করো, আমি পারিনি।"

অথচ এই অকৃতকার্যতার কারণ দূর করার শক্তিও আমাদের রয়েছে। এই কবিতা ও গানগুলির অমুদ্রিত খসড়াগুলি দেখলে আমাদের আশা জাগে। কবিরা যখন এত সংশোধনের পর কাব্যকে অনবদ্য করে তোলেন, আমরাও পারব নিরন্তর ঘষা-মাজায় জীবনকে সুন্দর করে তুলতে। আমাদের, মেয়েদের কত কাজ, স্বামী, সন্তান, সংসার সব সামলাতে হয়। কিন্তু এসবই আমাদের আনন্দ দেয়। আর এসব কিছু নিয়েও সমাজের জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব। ■

ধূমপান ছাড়তে কী কী করবেন



ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

চেষ্টা করেন অনেকেই। হয় স্বেচ্ছায়, কিংবা অন্যের অনুরোধে অথবা চাপে পড়ে। তবে এত চেষ্টা করেও অনেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না পুরোপুরি। আবার সেই পুরনো অভ্যেসে ফেরত আসা। ধূমপান না করা অবধি স্বস্তি পান না, এরকম পরিস্থিতিও তৈরি হয় একসময়। আর এই কারণেই ছাড়ি ছাড়ি করেও ছেড়ে উঠতে পারছেন না বহু মানুষ। এবার কী করবেন?

দেহের রক্তে চিনির মাপ কমে গেলেই ধূমপানের ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ধূমপানের ইচ্ছে হলে চিনি দেওয়া কিছু খেয়ে ফেলুন। একটু চিনিও খেতে পারেন। তবে এগুলো বেশি খেলে আবার ক্যালোরি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধূমপানের ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলে পছন্দের কাউকে ফোন করে নিতে পারেন।

যখনই ধূমপানের ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। যা করছেন, বন্ধ করে দিন। একটু হাঁটাহাঁটি করতে চলে যান। মিনিট দশেক হেঁটে আসতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। না পারলে, যতটুকু সম্ভব হেঁটে আসুন। কিছু না করার চেয়ে কিছু করা তো ভালো। হাঁটা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে। আর শারীরিক পরিশ্রম বাড়লে ধূমপানের ইচ্ছে কমে যাবে।

ধূমপানের ইচ্ছে মনের মধ্যে বেশি জেগে উঠলে, মনকে অন্য কাজে ডুবিয়ে রাখুন। বিশেষ করে কোনও সৃজনমূলক কাজে। ছবি আঁকা, লেখা, হাতের কাজ করা, বাগান করা ইত্যাদি। যে কোনও ধরনের কাজ। গানও শুনতে পারেন। ভালো লাগলে পছন্দের বই পড়ে নিন খানিকক্ষণ। ধূমপানের ইচ্ছেটা অনেকাংশে মরে যাবে। অতিরিক্ত জল খাওয়া কাজে আসতে পারে বিলক্ষণ। যখনই ধূমপানের ইচ্ছে জাগবে এক নিঃশ্বাসে দু'গ্লাস জল খেয়ে ফেলুন। এতে আপনার দেহে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়েছিল, ধূমপান না করার কারণে তা নষ্ট হবে। ধূমপানের ইচ্ছেও চলে যাবে।

খুব বেশি ধূমপান করতে ইচ্ছে হলে কী কারণে ধূমপান ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন, সেই কারণটি মনে করতে চেষ্টা করুন। কোনও পছন্দের মানুষের কারণে বা নিজের সুস্বাস্থ্যের কারণেই হয়তো এটা করতে চাইছেন। জোর করে সেই কারণটা ভাবতে থাকুন। আর ধূমপানের ইচ্ছে হবে না। মনে জোরও পাবেন।

নিকোটিন ফ্লেভারের চুইংগাম বেরিয়েছে। সেটা মুখে রাখলেও ধূমপানের ইচ্ছে কমে যায়। কিংবা অন্য কোনও লজেন্স অথবা চুইংগাম মুখে থাকলে একই ফল পাবেন।

দেহের রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেলেই ধূমপানের ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ধূমপানের ইচ্ছে হলে চিনি দেওয়া কিছু খেয়ে ফেলুন। একটু চিনিও খেতে পারেন। তবে এগুলি বেশি খেলে আবার ক্যালোরি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ধূমপানের ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলে পছন্দের কাউকে ফোন করে নিতে পারেন। তার সঙ্গে কথা বললে দেখবেন, এই ইচ্ছেটাই নেই আর। সঙ্গে কেউ থাকলে তাকে অনুরোধ করুন, আপনার সামনে যেন ধূমপান না করে। তার ধূমপানের দেখাদেখি আপনিও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না।

মনে এবং মাথায় চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ধূমপান করার ইচ্ছেও জাগে। কাজেই চাপ বাড়তে দেবেন না। রিল্যাক্সেশন অভ্যেস করুন। হাঁটাহাটি করলে, বই পড়লে, গান শুনলে মন ফ্রেশ হয়। মাঝেমধ্যে সিনেমা, নাটকও একই কাজ করে।

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা



গ্রামবিকাশের পুরোধাপুরুষ ‘ভারতরত্ন’ নানাজী দেশমুখ

ধর্মানন্দ দেব

দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান দেওয়া হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত প্রচারক আম্বাদাস অমৃতরাও দেশমুখকে। ‘ভারতরত্ন’ সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। আপামর ভারতবাসীর কাছে তাঁর পরিচিতি নানাজী দেশমুখ নামেই। তাঁর সঙ্গে এই সম্মান আরও দু’জনকে দেওয়া হয়। মরণোত্তর ‘ভারতরত্ন’ সম্মান দেওয়া হয় ‘পদ্মশ্রী’ ও ‘পদ্মবিভূষণ’ প্রয়াত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকাকে এবং ‘ভারতরত্ন’ সম্মান দেওয়া হয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে। ৭০তম সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে ওই তিন ভারতরত্ন প্রাপকের নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। এর আগে দেওয়া হয়েছিল ২০১৫ সালে প্রাক্তন প্রাধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং স্বাধীনতা যোদ্ধা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যকে।

কে এই নানাজী দেশমুখ?

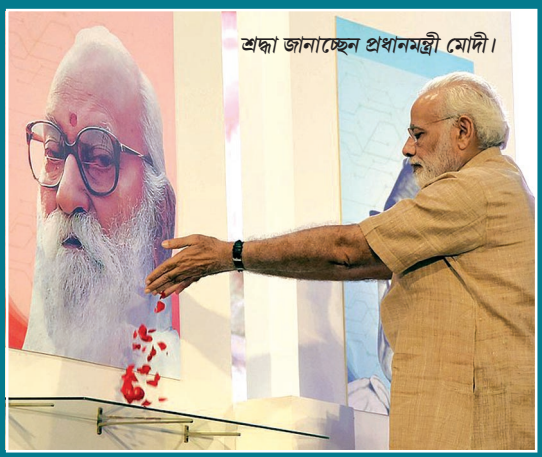
১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে মহারাষ্ট্রের পরভানি জেলার কাদোলি শহরে জন্মগ্রহণ করেন নানাজী দেশমুখ। সমাজকর্মী হিসাবে মহারাষ্ট্রে পরিচিত ছিলেন এবং আচার্য বিনোভা ভাবের দ্বারা শুরু হওয়া ভূদান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছোটোবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ। তাঁর স্থান হয়েছিল মামার বাড়িতে। মামার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না তাই নিজের পড়াশুনার খরচ বহন করার জন্য বাজারে সবজি বিক্রি করতেন। সেই উপার্জন থেকেই পড়াশোনার খরচ চালান। উচ্চশিক্ষা লাভ করেন পিলানীর বিড়লা ইনস্টিটিউট থেকে। তবে নানাজীর পরিবারের সঙ্গে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের যোগাযোগ ছিল। তাই নানাজীর ছোটোবেলাতেই সাক্ষাৎ ঘটে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে। তাঁকে দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে বালক বয়সেই স্বয়ংসেবক হন।

উচ্চশিক্ষার পর ১৯৫০ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তবে গোরখপুর যাওয়ার আগে তিনি কিছুদিন আগ্রায় সঙ্ঘের দায়িত্ব পালন করেন। সান্নিধ্যলাভ করেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের। সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতের কর্মজীবনের সমস্ত রকমের বৌদ্ধিক উপাদান।

১৯৪৭ সাল। স্বাধীনতার আনন্দ আর দেশভাগের বেদনার বিচিত্র মিশেল। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রধর্ম, পাঞ্চজন্য নামে দুটি সাপ্তাহিক এবং স্বদেশ নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর উপর। মার্গদর্শক ছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে প্রকাশনার দায়িত্বভার পালন করেন নানাজী।

১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয় তখন অন্যান্য সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের সঙ্গে নানাজী আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে আন্দোলন শুরু করেন। শিশু শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি ঝোঁক ছিল। কচিকাঁচারা যাতে বড়ো হয়ে ‘মানি মেকিং মেশিন’ না হয়ে ওঠে তার জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় পরম্পরায় গড়ে তুললেন ১৯৫০ সালে সরস্বতী শিশু মন্দির। সেখানে তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা শিশুমন্দিরের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকল। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর চার বছর পর ১৯৫৭ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ দীনদয়ালজীর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবার সংকল্প নেয়। সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর পরিকল্পনা মতো জনসঙ্ঘের দায়িত্ব নেন নানাজী। শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা। উত্তরপ্রদেশে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গড়ার নেপথ্যে ছিলেন তিনি। সেখানকার তাবড় কংগ্রেসী নেতা চন্দ্রভানু গুপ্তাকে একবার নয়, তিন তিনবার স্রেফ বুদ্ধির জোরে টেক্কা দিয়ে পরাস্ত করেন তিনি।

১৯৬৯ সালে নানাজী দেখতে যান মধ্যপ্রদেশের একটি ছোটো



শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

নানাজী দেশমুখের কৃতি

- ১৯৫০ সালে গোরখপুরে প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা।
- ১৯৭২ সালে গ্রামবিকাশের জন্য দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- গোন্ডা জেলার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য ৫৪ একর জমিতে 'জয়প্রভা' গ্রাম নির্মাণ ।
- কৃষকদের চাষের জন্য গ্রামে গ্রামে মাটির জলাধার নির্মাণ।
- কৃষকদের জন্য এক বছরে ২০ হাজার বাঁশের হ্যান্ডপাম্প বসানো।
- সীড ক্লাব গঠন।
- শিশু বিকাশের জন্য 'বালজগৎ' স্থাপন।
- সেবা নিবৃত নাগরিকদের গ্রামবাসীদের সেবা করার জন্য 'বাণপ্রস্থ অভিযান' প্রতিষ্ঠা।
- ১৯৯০ সালে চিত্রকূট গ্রামকে দত্তক নেওয়া।
- চিত্রকূটে গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
- চিত্রকূটে আরোগ্যধাম, উদ্যমিতা বিদ্যাপীঠ, গোশালা, বনবাসী ছাত্রাবাস, গুরুকুল, সুরেন্দ্রপাল গ্রামোদয় বিদ্যালয় ভারত সরকারের চারটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিচালন স্থাপন।
- চিত্রকূটে 'রামদর্শন' যোজনা।
- গোন্ডা জেলার ৮০টি গ্রামকে বিবাদমুক্ত করা।
- সমাজশিল্পী দম্পতি অভিযান।

পুণ্যস্থান চিত্রকূট। 'পুণ্যস্থান' কারণ এই চিত্রকূটেই শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে চোদ্দবছর কাটিয়েছিলেন। চিত্রকূটের অবস্থা দেখে নানাজীর মন উদ্বিগ্ন এবং অস্থির হয়ে ওঠেছিল। তখন মনে প্রাণে শপথ নিয়েছিলেন চিত্রকূটের সার্বিক উন্নয়নের। স্বাধীনচিত্তে মনোনিবেশ করেছিলেন এলাকার উন্নয়নে। তখন নানাজীর মুখে একটিমাত্র স্লোগান ছিল। সেটা হলো— 'প্রত্যেকের হাতে কাজ দাও, প্রত্যেকের ক্ষেতে জল দাও।' তাই প্রথম গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চিত্রকূটে গড়ে তুললেন 'চিত্রকূট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯৭২ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শনকে স্মরণ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি চিত্রকূটে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর শাখা। তখন ঠিক করা হয়েছিল এলাকায় বৃষ্টির জল ধরে রাখা হবে। তাই কৃষিকাজের জন্য গড়ে তোলা হয় জলাশয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোনও জলাশয় সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হলো না। স্থানীয় এলাকার পাথরকুচি, নুড়িপাথর আর কাদা দিয়ে গড়ে তোলা হয় এইসব ড্যাম বা ছোটো ছোটো বাঁধ। পরে গড়ে তোলেন কৃষি বিকাশ কেন্দ্র। গ্রামবাসীদের জন্য নানাজী গড়ে তুললেন 'সীড ক্লাব' (বীজ সংগ্রহশালা)। ধর্মকে বাদ দিয়ে যে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না, একথা মহাপুরুষরা বার বার বলেছেন। নানাজী তাই গড়ে তুলেছেন 'রামদর্শন'। রামদর্শনের মাধ্যমে রামায়ণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সবশেষে চিত্রকূটের উন্নয়নে যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন নানাজী সেটি হলো— 'সমাজ শিল্পী দম্পতি'। অর্থাৎ স্নাতকস্তরের দম্পতিরা একজন করে পাঁচটি গ্রামের উন্নয়নের দায়ভার নেবেন এবং তাঁরাই দেখাশোনা করবেন গ্রামবাসীদের। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে চিত্রকূটের দুর্দশার ছবি পাল্টে যায়। এই চিত্রকূটে এসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি নানাজীর সঙ্গে সহভোজে অংশ নিয়েছিলেন। নানাজীর কর্মকাণ্ড দেখে রাষ্ট্রপতি রেড্ডি বলেছিলেন— "সমস্ত রকমের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও নানাজী যে দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট গড়ে তুলেছেন আমি মনে করি তা জাতপাতের সংঘর্ষমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আমি সেই কারণেই বুঝতে পারছি চিত্রকূটকে ঘিরে থাকা ৮০টি গ্রামে কেন কোনো মোকদ্দমা নেই।"

১৯৭৫ সালে দেশে জারি হয় জরুরি অবস্থা। নানাজী অকুতোভয় চিত্তে জয়প্রকাশ নারায়ণের সহযোগী হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্দিরা গান্ধীর অপশাসন বিরোধী আন্দোলনে। পরে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। ওই সময় নানাজী সাংসদ নির্বাচিত হন। মন্ত্রীসভায় নানাজীকে যোগদানের অনুরোধ জানানো হলে তিনি বয়সের কারণ দেখিয়ে সবিনয়ে অস্বীকার করেন। তখন নানাজীর বয়স ছিল ৬১। আসলে তখন তিনি ঋষিকল্প মানুষ। গ্রামের গরিব মানুষের উন্নয়নের চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন।

১৯৯৪ সালে নানাজী নিজের দেহদান করে যান দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সে। ১৯৯৯ সালে নানাজী দেশমুখ পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি তৈরি করেছিলেন চিত্রকূট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নানাজী দেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সাংসদ মনোনীত হন। ২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। পরে নানাজীর ইচ্ছে অনুসারে মরণোত্তর দেহ দান করা হয় দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে। আর সেই নানাজীকে কেন্দ্রের বর্তমান মোদী সরকার দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' প্রদান করে নানাজীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছে। তাই ভারতরত্ন প্রাপকদের নাম ঘোষণার শেষে দেশের প্রধানমন্ত্রী ২৫ জানুয়ারি, ২০১৯ সালে এক এক টুইট বার্তায় জানান দেশবাসীকে—

"Nanaji Deshmukh's stellar contribution towards rural development showed the way for a new paradigm of empowering those living in our villages. He personifies humility, compassion and service to the downtrodden. He is a Bharat Ratna in the truest sense!"

গ্রামবিকাশের পুরোধাপুরুষকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা মোদী সরকারের নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

নানাজী দেশমুখই গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে অন্ত্যোদয়ের পথ দেখিয়েছেন

ড. স্বদেশ সিংহ

স্বাধীনোত্তর ভারতে কতিপয় সর্বজনসম্মানিত দুর্লভ মানবিকগুণ সম্পন্ন নেতাদের অন্যতম ছিলেন এই মানুষটি। —''আমরা মোটেই নিজ স্বার্থের জন্য পৃথিবীতে আসিনি কেবলমাত্র নিপীড়িত ও অবহেলিতদের জন্যই আমাদের জীবন ধারণ।'' বাক্যটি নানাজীর ও তাঁর সমগ্র জীবনটিই ছিল এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে, তাঁর মৃত্যুর আট বছর পর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করেছে। অন্ত্যোদয় অর্থে সমাজের অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে থাকা মানুষটিকে সর্বার্থে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার পন্থা হিসেবে তিনি 'গ্রামোন্নয়ন'কেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন একজন নিপুণ সংগঠক, চিন্তাবিদ, বিপ্লবী তথা সমাজ নির্মাণের স্থপতি (সমাজশিল্পী)। তাঁর নিরলস কাজের মাধ্যমে তিনি একাধারে গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ', পণ্ডিত দীনদয়ালের 'অন্ত্যোদয়', জয়প্রকাশ নারায়ণের 'সর্বোদয়'-এর ত্রিধারাকে গ্রামোদয়ের খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তাঁর কর্মভূমি ছিল সমগ্র উত্তরপ্রদেশ (অবিভক্ত)। তাঁর কাজের মূল কেন্দ্র ছিল গোরক্ষপুর। এখান থেকে সঙ্ঘের কাজকে তিনি সমগ্র পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে দেন। সেই সুদূর অতীতে ১৯৫০ সালে তিনি গোরক্ষপুরে শিশু শিক্ষার জন্য প্রথম 'সরস্বতী শিশু মন্দিরের' সূচনা করেন। যার শাখা প্রশাখা আজ সারা ভারতব্যাপী ১৮০০০টি স্থানে পরিচালিত হচ্ছে। নানাজী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দীনদয়ালজীর সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী হলেও নানাজী সর্বদাই তাঁকে জ্যেষ্ঠের সম্মান দিতেন। সঙ্ঘ মুখপাত্র 'পাঞ্চজন্য' ও 'রাষ্ট্রধর্মের' যখন প্রথম লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশ শুরু হলো, তখন নানাজী ছিলেন সংগঠন সম্পাদক ও অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন সম্পাদক। এরই মধ্যে ১৯৫১ সালে শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন ভারতীয় জনসঙ্ঘের জন্ম হলো।

আর এস এস-এর তরফ থেকে শ্যামাপ্রসাদকে সাহায্য করতে কিছু তরুণকে নিয়োগ করা হয়। পণ্ডিত দীনদয়ালের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন অনুজ্ঞাবদ্ধ স্বয়ংসেবক নানাজী। তাঁর ওপর সমগ্র উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রসার ঘটনানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী ২৫ বছর কায়মনোবাক্যে কাজ করে তিনি ভা. জ. সঙ্ঘকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি এখানকার প্রতিটি মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে দলের প্রসারণের পুরোধা ছিলেন। উত্তরপ্রদেশে দলের চমকপ্রদ বৃদ্ধির কারিগরের গৌরব যেমন নানাজীর প্রাপ্য, তাঁকে সহায়তা করতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রবাদপ্রতিম বাগ্মীতা ছিল দোসর। এরই সঙ্গে সমগ্র কর্মকাণ্ডকে সঠিক দিশা নির্দেশের কাণ্ডারী ছিলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। কাজের ফাঁকে নানাজী কিন্তু ভিন্ন ভাবধারার নেতা চরণ সিংহ ও রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গেও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বস্তুত, তিনি লোহিয়াকে জনসঙ্ঘের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, যার ফলে লোহিয়া সাংগঠনিক কাজকর্ম রপ্ত করার প্রাথমিক সুযোগ পান। হঠাৎ পণ্ডিত দীনদয়ালজীর রহস্যময় মৃত্যুর পর অটলবিহারী বাজপেয়ীর ওপর দলের সামগ্রিক দায়িত্ব পড়ে। বাজপেয়ীর কোর কমিটিতে লালকৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে নানাজী ও আরও কয়েকজন অন্তর্ভুক্ত হন।

এরই মধ্যে ৭০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় দেশ দুর্নীতি ও অরাজকতার কবলে পড়ে। তরুণ-তরুণী, ছাত্রদল দেশের নানান প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। এমন একটা পরিস্থিতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। জয়প্রকাশজীকে এই বিষয়ে রাজি করাতে নানাজী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি জয়প্রকাশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই সময়ে আয়োজিত একটি সভায় জয়প্রকাশের উপস্থিতিতে নানাজী সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন—



আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে নানাজী দেশমুখ।



নানাজীর মূর্তি উন্মোচনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

''ষাট বছর বয়স হয়ে গেলেই রাজনীতিবিদদের রাজনীতি ছেড়ে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।'' পরবর্তীকালে নানাজী তাঁর জীবনে এই নিজ ঘোষিত নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি বলরামপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন এবং তদানীন্তন সরকারে অনায়াসে একজন মন্ত্রী অবশ্যই হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু অবলীলায় তিনি রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যান। প্রয়াত দীনদয়ালজীর 'অন্ত্যোদয়' ও 'একান্ত মানবতাবাদের' দর্শনকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৬৮ সালে তিনি পণ্ডিত দীনদয়াল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁকে একাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন আর এস এস-এর দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক গুরু গোলওয়ালকার।

নানাজী এবার ফিরে চললেন প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে। গ্রামীণ ভারতে একটি বিকল্প উন্নয়নের ধাঁচা তৈরি করতে পরীক্ষামূলকভাবে গোন্ডা জেলায় 'জয়প্রভা গ্রাম' নাম দিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের বাঁশের তৈরি পাইপের টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করলেন। এই জয়প্রভা নামের প্রথমটি জয়প্রকাশের জয় ও প্রভা হলো জয়প্রকাশের স্ত্রী যিনি দীর্ঘদিন মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিড ও নাগপুর অঞ্চলেও প্রকল্পের কাজ শুরু হলো। দুর্ভিক্ষ তাড়িত বিড অঞ্চলে নানাজী প্রচুর সংখ্যায় Check Dam তৈরি করালেন। এর পরই তিনি কর্মভূমি পরিবর্তন করে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে বিস্তৃত যে দীর্ঘ নিদারুণ দারিদ্র্য জর্জর ও পশ্চাদ্‌পদ চিত্রকূট অঞ্চল সেখানে এলেন। চিত্রকূটে মন্দাকিনী নদীর তীরে তিনি নির্মাণ করলেন 'সিয়ারাম কুটির'। ৫০ কিলোমিটার অঞ্চল ধরে ৫ শতাধিক গ্রামের তরুণ দম্পতিকে তিনি সমাজ শিল্পী হিসেবে গ্রামোদয়ের কাজে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। শয়ে শয়ে মানুষ তাঁর সহযোগী হন।

একদিকে তিনি যেমন স্থানীয় গ্রামবাসীদের তাঁর পাশে পেয়েছিলেন, তেমনি তৎকালীন বড়ো বড়ো শিল্পপতি— টাটা, মাহিন্দ্রা, গোয়েঙ্কা থাপারদেরও এ বিষয়ে উৎসাহী করে তোলেন। তারা অকাতরে সাহায্যের হাত উন্মুক্ত করে দেন। নানাজীর ব্যক্তিগত অনুরোধে এইসব শিল্পপ্রধানরা প্রায়ই প্রকল্প স্থলগুলি পরিদর্শনে আসতেন।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম প্রায়শই পিইউআরএ নামে প্রকল্পটির কথা বলতেন— (Providing urban utilities to rural areas)। এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে দুটো সুবিধে পাওয়া যায়। গ্রাম থেকে শহরে নিষ্ক্রমণ বন্ধ হয় একই সঙ্গে গ্রামের উন্নয়নও হয়। কালাম বলেছিলেন— এই প্রকল্পের কথা নানাজীর চিত্রকূটে সফর করাকালীন তাঁর মাথায় আসে। চিত্রকূটে গ্রামে বসবাসকারীদের সব রকমের শহুরে সুবিধের অধিকারী করা হয়। এই কাজ সফল করতে কিছু কিছু গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করে কাজ করার নানাজীর প্রচেষ্টা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে নানাজীর উৎসাহে গ্রামোদয় প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা একটি সুন্দর গান বেঁধেছিল 'হর হাত কো দেঙ্গে কাম, হর ক্ষেত কো পানি, ফির সে ধরতী সাজেগী য্যায়সে দুলিহন রানি'। অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

নানাজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে পারলেই গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হবে। তারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। গ্রাম ও গ্রামবাসীদের এই যুগ্ম পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ প্রশাসন ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও পরিবর্তন আসবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি মানুষকে স্বনির্ভর হয়ে সরকারের ওপর ন্যূনতম নির্ভরতার কথা বলতেন। তিনি প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ওপর জোর দিতেন। সে কারণে কৃষি, জল সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠনের গুরুত্বও ছিল তাঁর কাছে অপরিসীম। কেবল স্থানীয় মানুষেরা একটি উন্নয়ন প্রণালী অনায়াসে গড়ে নিতে পারবে এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

এই সূত্রে কৃষিকে লাভজনক করে তুলতে নানাজী প্রথমেই জল সংরক্ষণ করতে পূর্বোল্লিখিত চেক ড্যাম নির্মাণ করান। স্থাপন করেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, যেখানে উপযুক্ত ও কার্যকরী গবেষণার মাধ্যমে অলাভজনক কৃষি ক্ষেত্রগুলিকেও লাভজনকে পরিবর্তন করা যায়।

দেখার বিষয়, একদিকে তিনি গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা নিয়ে শুরু করলেন। 'নানাজী দুনিয়া' (শিশুর পৃথিবী), একই সঙ্গে গ্রামে গড়ে উঠল 'মহাত্মা গান্ধী গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়' যেখানে থাকবে উচ্চশিক্ষায় সবরকম ব্যবস্থা। এই বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল শুধু মাত্র গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষাকে মূল বিষয়সূচি করে দেশের মধ্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি চালু করেন 'আরোগ্য ধাম'। এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিলত আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা। একই সঙ্গে এখানে প্রাচীন আয়ুর্বেদ পদ্ধতি, যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিদ্যারও বিভাগ ছিল। নানাজী যেহেতু স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ওপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করতেন সেই কারণে চালু করেছিলেন 'উদয়মিতা বিদ্যাপীঠ', এগুলির কাজ ছিল স্বনির্ভর প্রকল্প তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর বিশেষত্ব ছিল এমন সব বিকল্প উদ্যোগ চিহ্নিত করা যেখানে খুব অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে পর্যাপ্ত লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সমাজসেবা কাজের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সরকার তাঁকে রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করে। গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর সফল পরীক্ষামূলক কাজগুলির স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৯ সালে সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানেও ভূষিত করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতরত্নের জন্য তাঁর মনোনয়ন ঘোষণা করার পর বলেন— ''গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন কীভাবে দেশের গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের যথার্থ ক্ষমতায়ন করা যায়। নিম্নবর্গীয় মানুষদের অবস্থার পরিবর্তনে তিনি বিনয়, সহমর্মিতা ও সেবার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি সর্বার্থেই একজন ভারতরত্ন।'' গ্রামোদয়ের কাজে তাঁর গান্ধী, দীনদয়াল ও জয়প্রকাশের দর্শনকে সার্থকভাবে মানুষের কাজে প্রয়োগের সম্মান হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁর শতবর্ষে সরকার একটি ডাক টিকিটও প্রকাশ করেছিল।

(অনুবাদ : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্য : অর্গানাইজার)







মমতার প্রতি মুসলমানদের মোহ ভাঙা শুরু হয়েছে

সুকল্প চৌধুরী

অনেক দিন পর দেখা হলো হাজি মনিরুদ্দিন আলেমের সঙ্গে। অতীব রাজনৈতিক সচেতন এই মানুষটি মহেশতলার লাগোয়া সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের আশুতির বড়ো বকুলবাড়ির মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় মানুষের কাছে বড়ো হাজি সাহেব বলে পরিচিত মনিরুদ্দিন প্রথম থেকেই কংগ্রেসি ঘরনার সমর্থক। বিগত ১৯৭৭ সালে সাতগাছিয়া কেন্দ্রে জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় থেকে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে যুবক মনিরুদ্দিন প্রচার ও জনসভা শুরু করেছিলেন। প্রথম থেকেই এখনকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের অনুগামী তিনি। পরে 'ছোড়দা' তাঁর এক সময়কার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তথাকথিত অগ্নিকন্যার দলে গিয়ে সাংসদ হওয়ার ফয়দা তুলতে নাম লেখানোর সময় অনেকের মতো মনিরুদ্দিনও ঘাসফুলের শিবিরে ভিড়ে যান। এখনও পর্যন্ত তিনি রাজ্যের শাসক দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কংগ্রেস শিবিরে থাকার জন্য একটা সময় তাঁকে অনেকবারই বামেদের হাতে হেনস্থা হতে হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তিনি তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং দলনেত্রীর কাজকর্মে হতাশ।

এই বাংলার অনেক মুসলমানের মতো তিনিও মনে করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের একমাত্র মসিহা। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং চীন ঘেষা সিপিএম ও জামাত, আই এস সমর্থক অতি বামেদের ভ্রান্ত প্রচার ও ভুল ধারণার জন্য তিনিও প্রবল বিজেপি বিদ্বেষী। অনেক মুসলমানের মতো তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি একই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলেমায়ে হিন্দের সদস্য। এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি আছেন। সব মিলিয়ে 'হিন্দুদের দল' বিজেপি বিদ্বেষ তাঁর মজ্জায় প্রায় প্রকাশ্যেই প্রবাহিত। তাঁর রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় সংগঠনের বিভিন্ন সভায় দেশ বিরোধী বক্তব্যের সঙ্গে বিজেপির প্রতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত উচ্চকিত মন্তব্য করেন তিনি। পোশাকে, সজ্জায়, আচরণে, খাদ্যাভাসে, কথায় নিজেকে 'প্রকৃত মুসলমান' বলে প্রচারও করেন। তাঁর মতে জওহরলাল নেহরু, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, মুলায়েম সিংহ যাদব, মায়াবতী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আসল মুসলমান বন্ধু। এই নেতাদের কাছে মুসলমানরা নিরাপদ। এখন বাংলাতে মুসলমানরা ভালো আছেন। নিজেকে কট্টর মৌলবাদী বলতেও দ্বিধা নেই এই মানুষটি এখন অন্য ভাবনার দোলাচলে।



ছবি সিদ্দিকি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির এক সময়কার-সহ সভাপতি এবং আবু বরকত আতাউল গণিখান চৌধুরীর নেতৃত্বে থাকা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক অশতিপর আদ্যপান্ত বিজেপি বিরোধী এই মানুষটি কিছুদিন হলো অন্য ভাবনায় চলমান। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন সত্যিই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের বন্ধু নাকি সবটাই তাঁর রাজনৈতিক চাল। নব্বই দশকের শেষ দিকে রাজনৈতিক কারণে বিজেপির সঙ্গ ছাড়েন তৃণমূল সুপ্রিমো। দীর্ঘ তিন দশকের বামেদের অপশাসনের জন্য রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছিলেন। সেই সময় চতুর রাজনৈতিক নেত্রী রাজ্যের ২৩ শতাংশ মুসলমান ভোটের আশায় চরম বিজেপি বিদ্বেষী হয়ে পড়েন। প্রতি শুক্রবার দেবী সন্তোষীর ব্রত রাখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাথায় হিজাব

তুলে নেন। সকলেরই মনে আছে ২০১১ সালে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা তুলতে হিজাব পরে গিয়েছিলেন। রেল দপ্তরের একটি হিসাব অনুসারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকায় সময় এই রাজ্যের মোট ১৪২৫৩ জনকে চাকরী দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৩৪৯৮ জন স্থায়ী পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

অস্থায়ীদের প্রায় সবাইকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল বলে পূর্বতন রেলমন্ত্রী সিপি যোশী এবং পরবর্তী সময়ে পবন কুমার বনশাল তাঁদের সরিয়ে দেন। মমতার সময়ে স্থায়ী পদে ২৪২১ এবং অস্থায়ী পদে ৮৭৪৩ জন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে রেল দপ্তরের কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিগত ২০১১ সালের নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই তৃণমূল নেত্রীর মুসলমান তোষণের চেহারা দেখেছেন বাংলার মানুষ। পূর্বতন প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ইদ্রিশ আলির উস্কানিতে বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের রাজ্য থেকে বহিষ্কারের দাবিতে কলকাতা শহরে যে সাম্প্রদায়িক ভয়াবহ আবহ তৈরি হয়েছিল তাকে সমর্থন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় আসার পর পার্কস্ট্রিট বা কামদুনির মতো অমানবিক ঘটনার পরেও তোষণের স্বার্থে কেবলমাত্র মুসলমান বলে অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এরপর কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী সহ বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করে এক তরফা ভাবে নির্দিষ্ট করে মুসলমানদের সরকারি সহায়তা করেছেন। এক তরফা ভাবে মুসলমানদের চাকরি দিয়েছেন। ওবিসি কোটায় প্রায় সমস্ত মুসলমানদের এনেছেন। হালফিলে জনগণের অসন্তোষ টের পেয়ে অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। অপর দিকে গোরু পাচার-সহ বিভিন্ন অপরাধ দিনের পর দিন বাড়লেও প্রথম দিকে প্রশাসন উপর মহলের নির্দেশে ছিল নিশ্চুপ। খাগড়াগড় কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর হতেই এই সব অপরাধীদের ধরা পড়তে দেখা যায়। অপরাধীরা বেশির ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং অনেকেই অনুপ্রবেশকারী।

সকলেরই মনে আছে ক্ষমতায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই এখনকার মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় বুলি 'পরিবর্তনের' পরিবর্তে হয়ে ওঠে 'সব করে দিয়েছি'। বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'সংখ্যালঘুদের' নামের আড়ালে মুসলমানদের সমস্ত কিছুতেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বস্তুত এখনও তাই করেই যাচ্ছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও মুসলমান সমাজের প্রশ্ন— আদৌ কি মুসলমানদের প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে। মুসলমান যুবক সমাজের কিছু চাকরি হয়েছে, অনেকেই সরকারি ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েকজন সরকারি দলে নাম লিখিয়ে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। আবার গোরু পাচার-সহ বিভিন্ন অপরাধ করেও শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ নেই বেশ কিছু মুসলমান যুবক আর্থিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখানেই কি শেষ? সম্প্রতি মহেশতলার ডাকঘরে অনুষ্ঠিত এস্তেমাগায় এমনই প্রশ্ন তুলেছেন হাজি মনিরুদ্দিন সহ অনেকেই। বড়ো হাজি সাহেবের কথায়, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বাদ দিয়ে কেবল মাত্র মুসলমানদের উন্নয়ন হবে, মুসলমানদের ঘরে কেবল চাকরির চিঠি আসবে, বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পাবে তা কখনই হবে না। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, এই রাজ্যে মুসলমানদের জন্য যত উন্নয়নের ঢাক পেটানো হচ্ছে তার সত্যতা কতটুকু। তিনি মনে করেন 'অনুপ্রাণিত' হওয়ার মতো বাস্তব সত্য আছে কি। একই প্রশ্ন তুলেছেন ফুরফুরা শরীফের প্রধান ত্বহা সিদ্দিকি। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন মুসলমান উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলা না বন্ধ করলে 'সিপিএমকে কবর থেকে তুলে ক্ষমতায় বসাবেন'। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো এক ভাইরালে তাঁর বক্তব্য— বিজেপিকে তিনি খারাপ মনে করেন না। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলাম, অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহারও অনেকবারই 'সততার প্রতীকের' মিথ্যাচারিতার মুখোশ খুলেছেন। জয়নগর মজিলপাড়ায় অনুষ্ঠিত একটি মজলিসে ভাষণ দিতে গিয়ে দিল্লির মেহরালির কুতুবশাহী চবুতরা মসজিদের ইমাম মাওলানা তব্বিবুর হোসেন আগা বলেছেন এই রাজ্যের মুসলমানদের থেকে গুজরাট, রাজস্থানের মুসলমানরা ভালো আছেন। বিশেষ করে গুজরাটে করসেবক কাণ্ডের পর কিছুদিন অস্থিরতা থাকলেও সবই এখন ইতিহাস। গুজরাট মুসলমানদের জন্য স্বর্গরাজ্য না হলেও মিথ্যা ফুলঝুরিতে বসবাস করেন না। সেখানকার বয়ন শিল্পী বা স্বর্ণকারেরা বাংলার থেকে ভালো আছেন। কলকাতা লাগোয়া একটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক সফিকুল আহাসান মনে করেন মুসলমানদের প্রতি স্তোকবাক্য এবং মিথ্যাচার সব থেকে বেশি অপমানকর। দেশের যা আর্থ সামাজিক অবস্থা তাতে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ কখনই প্রচুর অর্থের মুখ দেখবেন না। আর দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের মমতা, রাহুল, মায়াবতী, মুলায়েমরা কিছুদিন দু'টাকা কেজিতে চাল দিতে পারবেন কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

তিনি মনে করেন, ধরে নেওয়া যাক গোটা দেশে ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মাত্র ১৫ কোটি মুসলমানদের আর্থিক ভাবে উন্নত করবেন। কিন্তু গোটা দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে তিনি অমর্ত্য সেনের মতো একশটা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদকে উপদেষ্টা রাখলেও কিছু করতে পারবেন না। ফলে মুসলমানদের জন্য সব করে দিয়েছি বলে কথার ফুলঝুরি ছড়ালে হিন্দু মুসলমান সবাই নিজ নিজ কারণে কেবলমাত্র ক্ষুব্ধ হবেন।

ফিরে আসা যাক হাজি মনিরুদ্দিনের কথায়। তাঁর সাফ কথা এখনকার মুসলমান সমাজ নিজেদের ভালোমন্দ, অধিকার বুঝে নিতে জানে। অনেক মুসলমানই এখন কোনও ইমাম, পিরজাদা, মাওলানা বা রাজনৈতিক নেতার কথায় অন্ধ হয়ে চলে না। বড়ো হাজি সাহেবের আশুতোষ কলেজে পড়া নাতি জানতে চায় কেন বিজেপি খারাপ। কেউ বললেই কি মোদী সাম্প্রদায়িক হবেন। বিজেপি একবারও মুসলমানদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলে? বড়ো হাজি সাহেব মনে করেন, এসব প্রশ্ন তোলা মানেই বিজেপির দিকে এখনই ঢলে পড়া নয়। কিন্তু রাহুল বা মমতার দিকেও নিঃশর্ত সমর্থনও নয়। বাম, কংগ্রেস, তৃণমূলের শাসন দেখা শেষ, এখন তবে বিকল্প কী। প্রশ্ন ওঠা মানে বিতর্কের শুরু। আর বিতর্ক মানেই এক কথায় মেনে নেওয়া নয়। আর মেনে না নেওয়া মানে মোহ ভঙ্গের দিকে যাত্রা শুরু এমনটাই মনে করেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ তথা ধর্মীয় নেতা হাজি মনিরুদ্দিন।

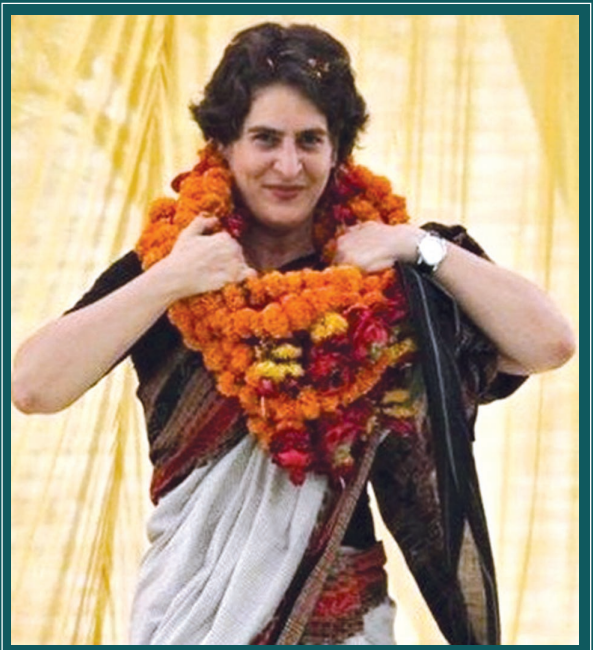
প্রিয়াঙ্কার পক্ষে কংগ্রেসকে টেনে তোলা খুবই কঠিন

সৌমেন ঘোষ

গত ১১ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের লখনৌতে গান্ধী পরিবারের নতুন উত্তরাধিকারী রাজীব তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর (বঢরা) কংগ্রেসের সম্পাদক পদে অভিষিক্তা হবার পর প্রথম রোড শোতে বড় সংখ্যক জনসমাগম লক্ষ্য করে মিডিয়া সহ কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে সদ্য নিযুক্তা গান্ধী পরিবারের সদস্যের এহেন জনপ্রিয়তা দেখে কংগ্রেস ভক্তরা তার মধ্যে পিতামহী ইন্দিরা গান্ধীর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ছয় দশক রাজপাট চালিয়ে আসা শতাব্দী প্রাচীন ক্রমক্ষয়িষ্ণু দলটির কর্মী সমর্থকরা নাতনি প্রিয়াঙ্কার মধ্যে ইন্দিরার চেহারাগত সাদৃশ্য দেখে নতুন করে আশায় বুক বাধছেন। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও গান্ধী নেহরু পরিবারের পরিচিতিকে মূলধন করে ভারতীয় রাজনীতি এই শতায়ুপ্রাচীন দলটি টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দিরার প্রতিচ্ছবিকে আশ্রয় করে কংগ্রেস দল কতটা উজ্জীবিত হতে পারবে আগামী দিনে?

এই প্রসঙ্গে এখন কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের ইতিহাসটা একটু ফিরে দেখা যাক। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিম পর্বে মহাত্মা গান্ধীর অন্ধস্নেহের আশ্রয়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিয়ে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস তথা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার কথা সর্বজনবিদিত। স্বাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রায় দের দশক রাজত্ব করার পর নেহরুর সুপ্ত বাসনা ছিল কন্যা ইন্দিরাকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যাওয়া। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নেহরু তার বিখ্যাত 'কামরাজ প্ল্যানের' মাধ্যমে দলের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত নেতাদের ডানা ছেঁটে আগামী দিনে কন্যা ইন্দিরার রাজ্যাভিষেকের পথটিকে অত্যন্ত সুকৌশলে কন্টকমুক্ত করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন দলের মধ্যে পরিবারতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিকতা এবং গোষ্ঠীতন্ত্রের—যা তার উত্তরাধিকারীগণ সযত্নে অনুসরণ করে চলেছে।

ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই ইন্দিরা তার পিতা নেহরুর সমসাময়িক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার পথে পা বাড়ান। ফলে দলের মধ্যে সৃষ্টি হয় গভীর অসন্তোষ যার থেকে পরবর্তীকালে কংগ্রেস দলের চিরকালীন ভাঙ্গনের রাজনীতির



> ইন্দিরা ও প্রিয়াঙ্কার মধ্যে প্রজন্মগত ব্যবধান অনেক। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের ভারতবাসী আগের মতো গান্ধী ও নেহরু পরিবারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনে রাজি নয়। সচেতন, যুক্তিশীল বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিভূ পরিবারতন্ত্রে কতটা আস্থা দেখাবে তা বলা শক্ত।

সূত্রপাত ঘটে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়স্তরে একসঙ্গে অনেক পুরানো ও প্রতিষ্ঠিত নেতার আকস্মিক অপসারণের ফলে কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক স্তরে বড় ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময় ইন্দিরা গান্ধী অতিদ্রুত এবং বিচার বিবেচনা ছাড়াই তার নিজের পছন্দের 'ইয়েস ম্যান'দের সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত করেন। তখন থেকে সাংগঠনিক দক্ষতা, জনপ্রিয়তা বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা নয় গান্ধী পরিবারের নেক নজর লাভই কংগ্রেস দলে বিভিন্ন স্তরে পদ লাভের প্রধান মাপকাঠি হয়ে দাড়ায়। ফলস্বরূপ কংগ্রেস তার যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক কাঠামো হারিয়ে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলে পরিণত হয়। আর এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন, গান্ধী নেহরু পরিবারের তল্পিবাহক, জনভিত্তিহীন সুযোগ সন্ধানী ধান্দাবাজ ভুঁইফোর নেতা দলের মধ্যে ভিড় জমাতে শুরু

করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের দল হিসাবে যে বিরাট সুনাম, জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা কংগ্রেস ভোগ করত তার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কংগ্রেস এখন গান্ধী নেহরু পরিবারের নিজস্ব দলে পরিণত হয়।

১৯৭১ সালে আমেরিকার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপী ঠান্ডাযুদ্ধের আবহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জনমনে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' সমর্থকদের এই অভিধায় ভূষিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্র পরিষদ, যুবকংগ্রেস ইত্যাদি সংগঠনের নামে এমন এক তরুণ প্রজন্মকে সামনের সারিতে তুলে আনেন তিনি, যাদের অনেকেরই সামাজিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতার অভাব ছিল। দলের সাংগঠনিক স্তরে 'স্তাবকতা', 'পদলেহন' ইত্যাদি গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের বাড়বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অন্ধ ইন্দিরা অনুগামীদের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করা বা দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মতো মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এই পথেই নষ্ট করে দেওয়া হয় দলের মধ্যে বহু স্বাধীনচেতা যোগ্য ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের নগ্নরূপ দেখা দিল ১৯৭৫ সালের জাতীয় জরুরী অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে। বিরোধী দল, সংবাদ মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও কণ্ঠরোধের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলল। এই সময় ভারতে নেমে আসে গণতন্ত্রের এক কালো অধ্যায়। এই পর্বেই ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল দাপট যথেষ্ট লক্ষণীয় ছিল।

অতপর ১৯৮৪ সালে ইন্দিরার হত্যাকান্ড ঘটল। মায়ের সহানুভূতির আবেগকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাজনীতিতে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ' রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় সভাপতি পদে অভিষিক্ত করে আগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যান্য সম্ভবনাময় নেতাদের অনৈতিকভাবে সরিয়ে দেয়। আবার রাজীব হত্যার পরবর্তী অল্প কিছুকাল কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীপরিবারের নেতৃত্বের বাইরে থাকলেও অটল বিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে নরসীমা রাও, সীতারাম কেশরী প্রমুখের. মতো প্রবীণ নেতাদের অসম্মানজনক ভাবে অপসারিত করে রাজীব পত্নী সোনিয়া গান্ধীকে সভাপতি পদে আনা হয়। একে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দলের মধ্যে পুনরায় ভাঙন ধরে।

ইউ পি এ সরকার গঠনের সময় জনমতের চাপে বিদেশিনী ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী পদে না বসতে পারলেও সোনিয়া গান্ধী তার বশংবদ মনমোহন সিংহকে শিখণ্ডী রূপে দাড় করিয়ে বকলমে 'কংগ্রেসের অন্তরাত্মা' সোনিয়া গান্ধী নিজ শাসন কায়েম রাখেন। এবং অতি সুদক্ষভাবে পুত্র রাহুলের জন্য কংগ্রেসের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার সকল পথ প্রসস্থ করেন।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বি জে পি শুধু এককভাবে ক্ষমতা দখলই নয় শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের আসন সংখ্যা ৫০-এর নিচে নামিয়ে আনে। দলের পুনরুত্থানের জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় রাজীব-সোনিয়া পুত্র রাহুলের হাতে। আসন্ন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে রাহুলের হাত শক্ত করার জন্য বোন প্রিয়াঙ্কাকে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত করে সামনে আনা হচ্ছে। আজ থেকে ৬০ বছর আগে ১৯৫৯ সালে বসন্তকালের শুরুতে নেহরু কন্যা ইন্দিরাকে কংগ্রেস সভাপতি পদে অভিষিক্ত করেন সকলকে হতচকিত করে দিয়ে। আর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও লখনৌতে সমাবেশের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন ইন্দিরা। সেই ট্রাডিশন অনুসরণ করে কংগ্রেস তার পরম্পরাগত পরিবারতন্ত্রের নিদর্শন স্বরূপ উত্তর প্রদেশের লখনৌ শহরে জমকালো রোড-শো-এর মাধ্যমে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে তুলে ধরতে চাইছে। এখন প্রশ্ন হল ৬০ বছর পর একই চিত্রনাট্য তৈরি করে ইন্দিরা গান্ধীর নাতনি ভারতের জরাগ্রস্থ গ্রান্ড ওল্ড পার্টিকে চাঙ্গা করে তুলতে কত দূর সক্ষম হবেন।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গত ষাটের দশক আর একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রে বিস্তর ফারাক। সময় এবং পরিস্থিতির বিচারে ইন্দিরা গান্ধীকে অনেক সুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন দেশটিতে কংগ্রেস দলের যে অবিসংবাদী প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল তাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই ইন্দিরার পক্ষে শক্তিশালী বিরোধী দলের চ্যালেঞ্জ ছাড়াই উঠে আসা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের গান্ধী পরিবারের সদস্যদের বি. জে. পি-র মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। মুখোমুখি হতে হচ্ছে কঠিন চ্যালেঞ্জের। তদুপরি ছয় দশকের অধিক সময় ধরে দলের অবিরাম ভাঙ্গা গড়ার পরিণামে কংগ্রেসের একক প্রাধান্য আজ ইতিহাস। এর সঙ্গে রাজ্যস্তরে আঞ্চলিক দলগুলির বাড়বৃদ্ধি (যেগুলির অধিকাংশ কংগ্রেস ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে) কংগ্রেসের শক্তিকে অনেকাংশে খর্ব করে দিয়েছে। তাই একক ক্যারিশিমায় নাতনি শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে কংগ্রেসকে টেনে তোলা অনেকটা দিবাস্বপ্নের মতো। তাছাড়া তিনি এখন এক্ষেত্রে পরীক্ষিতাও নন।

উল্লেখ্য যে, ইন্দিরা ও প্রিয়াঙ্কার মধ্যে প্রজন্মগত ব্যবধান অনেক। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের ভারতবাসী আগের মতো গান্ধী ও নেহরু পরিবারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনে রাজি নয়। সচেতন, যুক্তিশীল বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিভূ পরিবারতন্ত্রে কতটা আস্থা দেখাবে তা বলা শক্ত। বরং তারা এখন ভ্রষ্টাচারমুক্ত স্বাভিমান সম্পন্ন দৃঢ় ও শক্তিশালী বিকল্প শাসন ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ভারতের সুপ্রাচীন দলটি এই আধুনিক গণতন্ত্রের যুগেও গান্ধী-নেহরু পরিবারের বাইরে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তুলে আনতে ব্যার্থ। ফলে আজকের দিনে বারে বারে ব্যার্থ হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী পদবির অধিকারী একটি পরিবারকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেসি রাজনীতি অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতি ত্রিধা বিভক্ত। একদিকে বি. জে. পি আর অন্যদিকে কংগ্রেস আর বহু আঞ্চলিক দলের ঐক্য স্থাপনে অক্লান্ত প্রচেষ্টারত তৃতীয় বিকল্প। এই ত্রিমেরু প্রবণ ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে রাজীব তনয়ার পক্ষে ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেসের মরা গাঙে জোয়ার আনা সহজ কাজ হবে না। লখনৌ শহরে একটি রোড শোয়ে সাময়িক লোক সমাগম দেখে প্রিয়াঙ্কার বিরাট রাজনৈতিক সাফল্যের ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন। বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কার মধ্যে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গঠনগত সাদৃশ্যকে মাথায় রেখে তো নয়ই। ▮



পৌরাণিক নগর বঙ্গ

পরম্পরা

মহাভারতের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ এবং প্রতিটি দেশই স্বাধীন, কিন্তু জৈন গ্রন্থ প্রজ্ঞাপনার বর্ণনা থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্ত কোনো এক সময় বঙ্গের অধীন ছিল। বঙ্গের উল্লেখ গুন্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রিস্ট ৩য় শতক) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকূট স্তম্ভলিপি (৭ম শতক) তেও দৃষ্ট হয়।

গোপাল চক্রবর্তী

ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই হিসাবে 'বঙ্গ' এক প্রাচীন পৌরাণিক নগর। 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' পদে বঙ্গজনদের বগধদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বগধকে 'মগধ' বলেই অনুমান করেন ঐতিহাসিকরা। এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে 'মগধের প্রতিবেশী জনপদ' বলেই জানতেন বলে মনে করা হয়। বোধায়নের 'ধর্মসূত্রে' বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গজনপদের প্রতিবেশী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এমন অনুমান করলে ভুল হয় না। আরট্ট, পুণ্ড্র, সৌবীর বঙ্গ ও কলিঙ্গজনেরা একেবারে বৈদিক সংস্কৃতি বহির্ভূত এবং তাদের দেশে যাতায়াত করলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, বোধায়ন এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন।

মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গজনপদের উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্মজনদের সঙ্গে, সভাপর্বে পুণ্ড্রদের সঙ্গে। মহাভারতে বর্ণিত আছে ভীম দিগ্বিজয়ে বের হয়ে মুদগগিরি (মুঙ্গের) রাজকে হত্যা করে কোশীনদী তীরবর্তী পুণ্ড্ররাজকে পরাজিত করেন, অতঃপর তিনি ক্রমে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, প্রসুহ্ম রাজাদের এবং অনেক ম্লেচ্ছ কোমদের পরাভূত করেন।

রামায়ণেও অন্যান্য প্রাচীন জনপদের সঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ আছে। সকলেই অযোধ্যার অভিজাত বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনেরা লাল (রাঢ়) জনপদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। 'প্রজ্ঞাপনা'-নামক একটি জৈন উপাঙ্গে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল (রাঢ়) জনদের উল্লেখ করে উভয়কেই আর্য বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তকে বঙ্গজনদের অধিকারে বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

মনুসংহিতা রচনার কালে (২০০ খ্রি: পূ: থেকে ২০০ খ্রি:) বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হতো। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই যে আর্য সংস্রবের ফলে আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সিংহল দেশীয় পালিগ্রন্থ 'মহাবংশে' উল্লিখিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্বে বিজয় নামে বঙ্গদেশের এক রাজপুত্র লঙ্কা দ্বীপের রাজা হন এবং এদেশে এক বাঙালি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষ সিংহবাহুর নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহল দ্বীপ।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন গ্রিকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন তখন 'গঙ্গারিডই' জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিল। অধিকাংশ গ্রিক লেখকের মতে এই জাতি ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করত এবং পশ্চিমদিকের বিহার রাজ্যও তাদের অধীনে ছিল। সুতরাং এটা মনে করা অসংগত হবে না যে আলেকজাণ্ডারের সময় বাংলার রাজা প্রথমে মগধদেশ জয় করেন এবং পরে পঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই ঘটনা সত্য হলে বলতে হয় যে বাংলার এই সাম্রাজ্যই ঐতিহাসিক যুগে প্রথম সাম্রাজ্য।

মহাভারতের উল্লেখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ এবং প্রতিটি দেশই স্বাধীন, কিন্তু জৈন গ্রন্থ প্রজ্ঞাপনার বর্ণনা থেকে মনে হয় তাম্রলিপ্ত কোনো এক সময় বঙ্গের অধীন ছিল। বঙ্গের উল্লেখ গুন্টুর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ড (খ্রিস্ট ৩য় শতক) মেহেরৌলি স্তম্ভলিপি এবং বাতাপীর (বাদামী) চালুক্যরাজ পুলকেশীর মহাকূট স্তম্ভলিপি (৭ম শতক)-তেও দৃষ্ট হয়।



নদীয়ার পরামায়া

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নাম বাঙালি মাত্রই জানেন। নদীয়া নামের উৎস সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায় : নয়টি দিয়া বা প্রদীপ থেকে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। সুদূর অতীতে গঙ্গার মাঝখানে যখন সুবিস্তৃত চর জেগে ওঠে এবং মানুষের সমাগম ঘটতে থাকে, তখন কোনও তান্ত্রিক প্রতি রাতে নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তন্ত্রসাধনায় বসতেন। দূর থেকে লোকজন ওই প্রদীপের আলো দেখে, জাগরিত ভূখণ্ডটিকে নদীয়ার চর বলে অভিহিত করত। ক্রমে চরটিতে গ্রাম তৈরি হলো, নাম হলো নদীয়া। পরবর্তীকালে নদীয়া গৌড়বঙ্গের রাজধানী হয়ে উঠেছিল। রাজা বল্লালসেনের আমলে নদীয়া রাজ্য বলতে সমগ্র বঙ্গদেশই বোঝাত। নবদ্বীপেরও অপর নাম নদীয়া। নবদ্বীপ মানে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি। গঙ্গার পূর্বপারে চারটি দ্বীপ— অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ এবং পশ্চিমপারে পাঁচটি দ্বীপ— কোল দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ— এই নিয়েই নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে যে 'পোড়া মা' দেবী আছেন, তাঁর সম্পর্কেও একাধিক আখ্যান চালু রয়েছে। যেমন, বহুকাল আগে উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন বৃহদথ। তিনি কাশীতে দণ্ডী বা সন্ন্যাসী হয়ে শিলাখণ্ড ও দক্ষিণাকালীর মন্ত্রপূত ঘট নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নবদ্বীপে আসেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রতি রাতে স্বয়ং দেবী মহামায়া বৃহদথের কাছে এসে কিছুক্ষণ থাকতেন। নির্জন কুটিরে দেবীকে নিয়ে লীলাখেলায় তিনি দিনরাত কাটাতেন। হঠাৎ একদিন নবদ্বীপের চিনেডাঙার মূর্খ বামুন নরহরি এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। নরহরির সেবায় তুষ্ট হলে বৃহদথ তাঁকে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু দীক্ষার ক্ষণে সন্ন্যাসী কোনও বিভ্রমে নিজের সিদ্ধমন্ত্র শিষ্যের কানে বলে ফেললেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় বৃহদথ যারপরনাই দুঃখিত হলেন। মন অস্থির হয়ে উঠল। উচাটন মনে তিনি শিষ্যকে নিজের স্থাপিত ঘটে দক্ষিণাকালীর পুজো করতে উপদেশ দিয়ে চিরদিনের মতো নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তারপর নরহরি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে পণ্ডিত ও তান্ত্রিক হলেন।

কালক্রমে নরহরির নাতি প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম যখন নবদ্বীপে ন্যায়দর্শনের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, তখন গ্রামের প্রান্ত থেকে দেবীর ঘট নিয়ে এসে গ্রামের মাঝে এক বটগাছের মূলে প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামবাসীরা

পোড়া মা ছাড়াও নবদ্বীপে আরও তিনটি শক্তিপীঠস্থান আছে। যথা— আগমেশ্বরী তলা, ব্যাদড়াপাড়া ও মালঞ্চপাড়ায়।

সেখানেই দেবীর পুজো করত। কিছুদিন পরে বাজ পড়ে বটগাছটি পুড়ে গেলে ওই জায়গাটি পোড়া বটতলা ও দেবী পোড়া মা নামে অভিহিত হল। যদিও পোড়া মা শব্দটি 'পরামায়া' শব্দের অপভ্রংশ।

পোড়া মা-কে নিয়ে আর একটি কাহিনি হলো : বাসুদেব সার্বভৌমের অনেককাল আগে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ দক্ষিণাকালীর সাধক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গোপাল মন্ত্রে অন্য এক সাধকের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। দুজনে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, যিনি হেরে যাবেন, তিনি বিজয়ীর মন্ত্রশিষ্য হবেন। শাস্ত্রীয় বিচারসভা চলছিল ভবানন্দর বাড়িতেই— তাঁর ভদ্রাসনেই ছিল দক্ষিণাকালীর মন্দির। কিন্তু বিচারসভায় ভবানন্দই হেরে গেলেন। পরক্ষণেই পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো তিনি ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। তখন আচমকা তাঁর ইটের বাড়িতে ভয়ঙ্কর আগুন লেগে গেল। আগুন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লে, ভবানন্দ মন্ত্রশোধিত জল ছড়াতে লাগলেন যত্রতত্র, তারপর কোনোক্রমে প্রাণ হাতে করে, গোপালসিদ্ধ সাধককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে, পিছন ফিরে উভয়ে দেখলেন, পোড়া মন্দিরে দক্ষিণাকালীর কারালমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। উপবিষ্ট দেবীর কোলে বসে হাসছে নাড়ুগোপাল।

ভবানন্দর বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। পোড়া মন্দিরে দু-খানা মাত্র ইট অবশিষ্ট ছিল। সেই দুটো ইটের ওপর পোড়া মা-র আধার ঘট স্থাপন করে দেবীর পুজো শুরু হলো আবার। অনেক শতাব্দী পরে নদীয়ারাজ গিরিশচন্দ্র পোড়া মা তলায় ভবতারণ শিব ও ভবতারিণী কালীর দুটি মন্দির তৈরি করেন। গিরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা রাঘব একদা একটি গণেশমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সেটি দীর্ঘকাল মাটির তলায় ছিল। গিরিশচন্দ্রের আমলে সেই মূর্তিটি মাটির তলা থেকে তোলা হয়। তোলবার সময় মূর্তির শুঁড়টি ভেঙে যায়। ভবতারিণী কালীর বিগ্রহ ওই গণেশমূর্তি কুঁদেই খোদিত। ভবতারণ শিবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাঘবের পুত্র রুদ্র। গঙ্গার গ্রাসে শিবের মন্দির ভেঙে পড়লে শিবলিঙ্গটি তখন রাজা রুদ্র মাটির নীচে পুঁতে দেন। পরে সেই শিবলিঙ্গই গিরিশচন্দ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পোড়া মা ছাড়াও নবদ্বীপে আরও তিনটি শক্তিপীঠস্থান আছে। যথা— আগমেশ্বরী তলা, ব্যাদড়াপাড়া ও মালঞ্চপাড়া। কারণ চৈতন্যপূর্বকাল থেকেই নবদ্বীপে রাঢ়ীয় নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অখণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তি তত্ত্ব বা উৎসব-আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা সকলেই শাক্ত বা তান্ত্রিক এবং তাঁদের ঘরে ঘরে শক্তিপুজো হতো।

এখনও নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমায় শাক্তদেবীদের বড়ো বড়ো বিগ্রহ এবং শক্তিপুজোর বিপুল সমারোহ দেখা যায়।

নাথ সাধক মহাযোগী শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ

অমিত ঘোষদস্তিদার



মৎস্যেন্দ্রনাথ শৈবযোগ সাধক নাথ ধর্মের প্রবর্তক। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য গোরক্ষনাথ ১২ বছর বয়সে গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের নিকট নাথধর্মে (শৈবযোগ) দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন। গোরক্ষনাথের পিতা সূরয বশিষ্ঠগোত্রজ ব্রাহ্মণ। মাতার নাম সরস্বতীদেবী। গোরক্ষনাথের জন্ম সময় ও জন্মস্থান সঠিক জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে গৌতমবুদ্ধের আগেই গোরক্ষনাথজী আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'যোগীসম্প্রদায়বিষ্কৃতি' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় গোরক্ষনাথের জন্মস্থান গোদাবরী নদীর তীরস্থ চন্দ্রগিরি স্থানে। আবার গবেষকদের মধ্যে এক এক জনের এক এক রকম মত। কেউ বলেন পঞ্জাবের কোনও স্থানে, আবার কেউ বলেন পূর্ববঙ্গে, অনেকে আবার বলেন তাঁর জন্মস্থান পেশোয়ায়। ধর্মতত্ত্বানুযায়ী, ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাখ্যাকারদের মতে এবং নাথ ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে গোরক্ষনাথ অযোনীসম্ভব, পরব্রহ্ম নিরঞ্জনের দেহ থেকে তাঁর উৎপত্তি।

যোগীবর গোরক্ষনাথ ভারতবর্ষ-সহ বিশ্বের নানাদেশে আজও পূজিত। তিনি তাঁর গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের মতোই যোগসাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করে শিবত্বপ্রাপ্ত হন এবং জীবিতাবস্থায় শিবাবতার রূপে পূজিত হন। তাঁর নামে গোর্খাজাতির নামকরণ হয়েছে। তাঁর নামানুসারেই ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর শহর এবং জেলার নামকরণ হয়েছে।

হিমালয় থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ, বঙ্গদেশ থেকে কাশ্মীর গোরক্ষনাথের অলৌকিক প্রভাবের প্রমাণিতস্থল হয়ে উঠেছে। সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল মহাযোগী গোরক্ষনাথের কর্মক্ষেত্র। ভারত ছাড়া তিব্বত, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পিনাং প্রভৃতি স্থানে এই নাথ সাধক তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। খ্রি. ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্জাবের রাজা ভর্তৃহরি, শালিবাহন এবং নেপালের রাজা নরেন্দ্রদেব প্রমুখের কাছে গোরক্ষনাথ গিয়েছিলেন। এছাড়া বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যোগী, মহাযোগীর সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। অষ্টম শতাব্দীর সময়ে জানা যায় রাজা রসুল এবং তাঁর ভাই পুরাণ ভাগবত গোরক্ষনাথজীর শিষ্য ছিলেন। গুগার গুরু নামে খ্যাত রতন হাজি এবং রতন হাজির মাধ্যমে কাবুলের বহু মুসলমান এই মহাযোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগী হয়েছিলেন। কবিরের দোঁহাতে গোরক্ষনাথজীর উল্লেখ আছে। শিখ ধর্মগুরু নানকের লেখায় তাঁর কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ রামঠাকুরও তাঁর নাম করে গেছেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যীশুখ্রিস্টের জীবনের প্রথম ১২ বছরের ও পরবর্তী ১৭ বছরের জীবন কাহিনির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। নেপাল, তিব্বত ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থে যীশুখ্রিস্টের জীবনের ওই ১৭ বছরের উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায়, যীশুখ্রিস্ট নাথগুরু মহান যোগাচার্য গোরক্ষনাথের নিকট যোগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। যোগদীক্ষা গ্রহণের পর যীশুখ্রিস্ট নাথ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁর নাম হয় ঈশাইনাথ। দেশীয়-বিদেশি অনেক গবেষক তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ে একমত হয়েছেন।

অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট জেলার তরপ এবং চট্টগ্রামে যোগীবর গোরক্ষনাথজীর সাধনপীঠ ছিল। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে তিনিই হিন্দি সাহিত্যের জনক। গোরক্ষনাথজীর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো— যোগবীজ, গোরক্ষপদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্ত, গোরক্ষবোধ, জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, গোরক্ষযোগতন্ত্র, গোরক্ষসার, জ্ঞানশতক বা গোরক্ষবোধ, হঠযোগ, বিবেক মার্তণ্ড, যোগ-মহিমা, গোরক্ষগীতা, যোগ-চিন্তামণি, জ্ঞানামৃত, অমরৌঘপ্রবোধ, গোরক্ষ-সংহিতা প্রভৃতি। অধ্যক্ষ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গোরখপুরে গোরক্ষনাথের আসন প্রতিষ্ঠিত। ত্রেতাযুগ থেকে এই আসন প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরও ত্রেতাযুগ থেকে চলে আসছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বাবা গম্ভীরনাথ বললেন, না, কিন্তু আসন ঠিকই আছে। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সময় একবার এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় আর একবার এই স্থানের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল কিন্তু ওই সময়েও আসন রক্ষিত হয়। পরে বুদ্ধনাথ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন।''

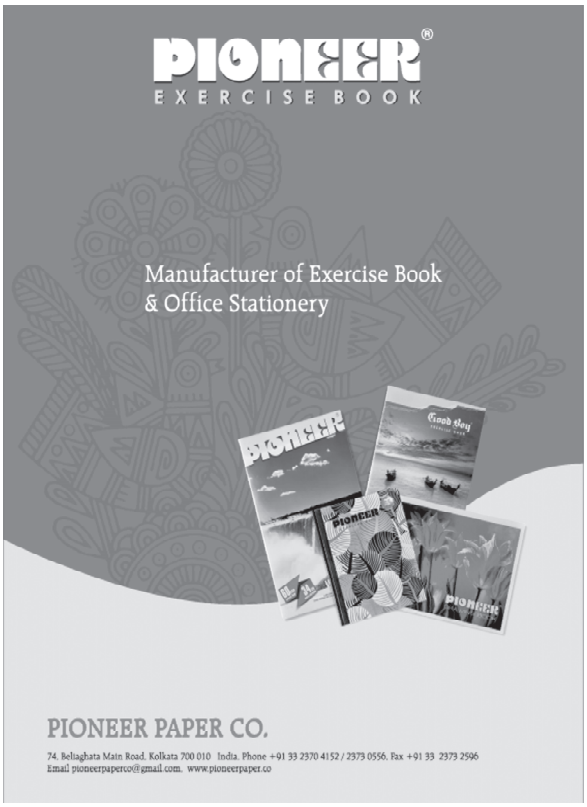
গোরক্ষনাথজী শৈবযোগী বা কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন হঠযোগ এবং রাজযোগের পুনরুজ্জীবনকারী মহাসাধক। নেপালের মানুষের কাছে তিনি জনবিগ্রহ রূপে পূজিত। পঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু, বালুচিস্তান, দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাধনসিদ্ধি কাহিনি আজও প্রচলিত। কাথিয়াওয়াড়, শকলদ্বীপে আজও তাঁর চরণ নিত্য পূজিত হয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল, কুমায়ুনের সিদ্ধস্থানে, ত্রিম্বকে গোরক্ষনাথজীর মূর্তি পূজিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দমদমে গোরক্ষবাঁশুরীর মূর্তি বহুশত বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছে। বেলগাঁওয়ের কানফাটা যোগীরা তাঁকে মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কালভৈরব মন্দিরে গোরক্ষনাথজীর বিগ্রহ আজও পুজিত হয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

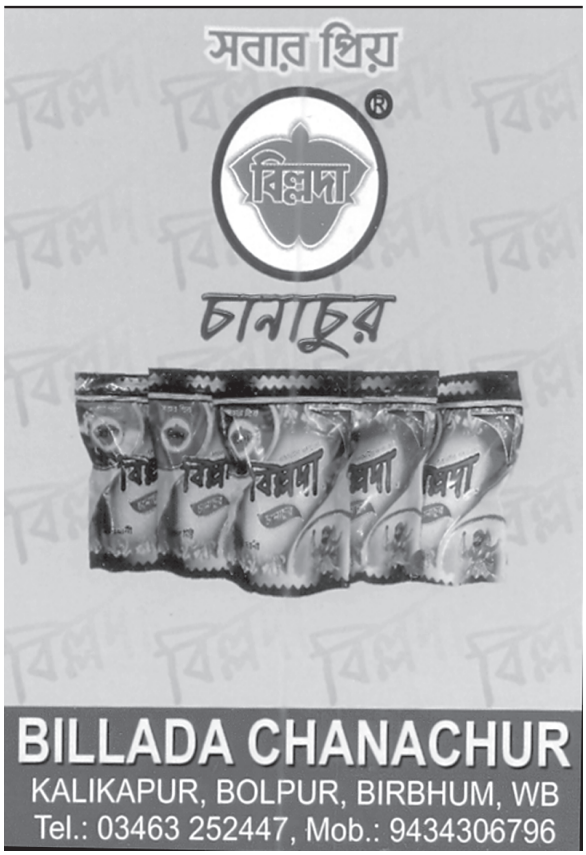
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



বিরোধীদের রামধনু জোট
ভারতীয় গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

অম্লানকুসুম ঘোষ

আমাদের দেশে জোট রাজনীতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। তালিকোটার প্রান্তরে দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির একমাত্র রক্ষক বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর এই পাঁচ মুসলমান রাজ্যের জোট। জোট রাজনীতির খেলায় সেদিন দাক্ষিণাত্যে ধ্বংস হয়েছিল জাতীয় সভ্যতা, লাভবান হয়েছিল ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বিদেশি স্বার্থ। স্বার্থের প্রয়োজনে জোট গঠন সহজে হলেও আদর্শের খাতিরে, দেশরক্ষার জন্য, জোট গঠন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হয়নি অত সহজে। খারাপ লোকেরা স্বার্থান্বেষী জোট গঠন করতে পারলেও, ভালো লোকেরা আদর্শের খাতিরে জোট গড়তে পারেননি সঠিক সময়ে। তাই দেখা যায় বহিরাগত মুসলমানরা জোটবদ্ধভাবে বিজয়নগর ধ্বংসের সমকালেই মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে জোট গড়তে ব্যর্থ হন রাজপুত রাজারা। মিরজাফর এবং ইংরেজ সহজেই জোট গড়ে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য হাজার প্রয়োজনেও জোটবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন গান্ধীজী এবং নেতাজী।

স্বাধীনতার পরেও আমাদের দেশে জোট রাজনীতি নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে প্রচুর। একথা ঠিক যে জোটবদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার ওপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি অনেকটাই নির্ধারিত হয়। স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শাসকদল কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৫ শতাংশ ভোট এবং ৭৪ শতাংশ আসন, অন্যদিকে বহুধাবিভক্ত বিরোধী দলগুলি এবং নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছিল ৫৪ শতাংশ ভোট এবং মাত্র ২৫ শতাংশ আসন। অধিক ভোট পেয়েও কম আসন পাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিরোধী দলগুলি পরবর্তী নির্বাচনসমূহে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার পরিকল্পনা করে। জোটবদ্ধ হবার প্রস্তুতি হিসেবে তারা তৎকালীন পার্লামেন্টে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্যামাপ্রসাদের নিজের দল জনসঙ্ঘ ১ শতাংশেরও কম আসন পেয়েছিল (মাত্র তিনটি), কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের যোগ্যতা দেখে তাঁকে বিরোধী দলনেতা মনোনীত করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলের তাবৎ নেতারা। নিঃসন্দেহে এই জোট ছিল আদর্শের দ্বারা গঠিত। শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে এই জোট গঠন প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদি তা না হতো, যদি ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এই জোট বজায় থাকতো, তাহলে ১৯৫৭-তেই নেহরু গদিচ্যুত হতেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে জোট রাজনীতির দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়েছিল সত্তরের দশকে। ১৯৭৭-এ এমার্জেন্সির কালো যুগের অবসানের পর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সেই ঐক্য ছিল ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রেমী রাজনৈতিক দলগুলির জোট। সেই দলগুলির নিজেদের মতাদর্শের মধ্যে ভিন্নতা ছিল, কিন্তু এমার্জেন্সির একনায়কত্বের অবসান কল্পে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তারা একমত ছিল, ভোট ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্রী সরকারকে পর্যুদস্ত করেছিল, একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে তারা সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম জোট সরকার গড়তে সক্ষম হয়েছিল তারা। বিভিন্ন দলের দ্বারা গঠিত সেই সরকারের মন্ত্রীসভায় ছিলেন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পাওয়া প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন সেই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। গণতন্ত্র রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করা এবং এরকম একটি মণিমাণিক্য-খচিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা সেই জোটও কিন্তু দেশকে স্থায়ী সরকার উপহার দিতে পারেনি। ১৯৭৭-এ গঠিত সরকার ১৯৮০-তেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সরকার পতনের একটাই কারণ, সরকারটি ছিল জোট সরকার।

ভারতের জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এর পরে জোট-রাজনীতির তৃতীয় পরীক্ষা হয়েছিল। প্রায় এক দশক পরে, ১৯৮৯ সালে, রাজীব গান্ধীর বোফর্স দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি জোট গড়েছিল। তারাও নিজেদের মতাদর্শের ভিন্নতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দুর্নীতি-বিরোধী লড়াইয়ে। কিন্তু নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হলেও নির্বাচন পরবর্তী যুগে সরকার চালানোর সময় তারা নিজেদের ঐক্য বজায় রাখতে পারেনি দীর্ঘদিন। জোট সরকারের পতন হয়েছিল একবছর শেষ হবার পূর্বেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই জোটের দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক বিজেপি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেনি যাতে মন্ত্রীপদ নিয়ে বিবাদের জেরে জোটে সমস্যা সৃষ্টি না হয়, তবুও শেষরক্ষা হয়নি। এরপর, নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে জোট মন্ত্রীসভার পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রশেকর, দেবগৌড়া, গুজরালের নেতৃত্বে একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। কোনোটিই

এমন কোনও ব্যক্তি কি বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে আছেন যিনি সকল দলমতের এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই সমস্ত দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং যার নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে সব কটি দল?

বর্ষপূরণে সক্ষম হয়নি। এই জোট জোট খেলা সমকালীন অর্থনীতিকে আহত করেছিল চরমভাবে। ভিপি সিংহ, চন্দ্রশেখর জমানার পর ভারতীয় অর্থনীতি দাঁড়িয়ে ছিল খাদের কিনারায়। দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য এসময় দেশের সোনা বন্ধক রাখতে হয়েছিল বিদেশের কাছে। আর দেবগৌড়া-গুজরাল জমানার পর দেশের অর্থনীতিতে সঞ্চিত ছিল রেকর্ড পরিমাণ বিদেশি ঋণ।

দেবেগৌড়া-গুজরাল জমানার পর ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দু'দফায় এনডিএ জোট সরকারের শাসন। এই সময় বহুদিন পরে ভারতবাসী পেয়েছিল একটি স্থায়ী সরকার। অতীতের জোট সরকারগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম এনডিএ সরকারের অকালমৃত্যু হলেও দ্বিতীয় এনডিএ সরকার তাদের পুরো সময় সরকার রক্ষা করতে পেরেছিল। জোট সরকার হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুরো সময় সরকার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র জোট গঠনকারী দলগুলির মধ্যে একটি দল অধিক শক্তিশালী ছিল এবং তারা জোটের নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করেছিল এবং সেই জোট সরকারের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির একটি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি ছিল এবং মতাদর্শগত ভাবে কিছুটা হলেও একতা ছিল বলে।

পশ্চিমবঙ্গও দীর্ঘদিন ধরে জোট রাজনীতির পরীক্ষাগার। ষাটের দশকের শেষের দিকে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ওয়ার্কার্স পার্টি, এসইউসি প্রভৃতি দলকে নিয়ে গঠিত হয় জোট সরকার। অজয় মুখার্জির মতো মুখ্যমন্ত্রী, প্রফুল্ল ঘোষের মতো কৃষিমন্ত্রী, জ্যোতি ভট্টাচার্যের মতো শিক্ষামন্ত্রী পেয়েও সেই সরকার দু'বারের চেষ্টায় একবারও বর্ষপূর্তি করতে পারেনি। পরবর্তীকালে একই পরীক্ষাগারে জোট সরকার গঠনের পরীক্ষা দিয়েছিল বামফ্রন্ট। সম্পূর্ণ অযোগ্য ও নীতিহীন লোকেদের দ্বারা চালিত হলেও সেই জোট সরকার স্থায়িত্বের দিক দিয়ে রেকর্ড করতে পেরেছিল শুধুমাত্র জোটের একটি বড়ো দল এককেন্দ্রিকভাবে জোটটি চালিয়েছিল বলে।

স্বাধীন ভারতে জোট রাজনীতি নিয়ে যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার নির্যাস আমাদের এটুকুই শিক্ষা দেয় যে, একটি জোট সরকার তখনই স্থায়ী হয় যখন জোট গঠনকারী দলগুলির মধ্যে একটি আদর্শগত মিল এবং পারস্পরিক ঐক্যভাব থাকে। অথবা জোট গঠনকারী দলগুলির মধ্যে কোনও একটি দল অধিক শক্তিশালী হয় এবং তারা জোটের নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে, যদি কোনও একজন সর্বজনমান্য নেতা তাদের নেতৃত্ব দেন যাকে জোট গঠনকারী দলগুলি সবাই মান্য করে।

দেখা যাক বর্তমানে মোদীবিরোধী জোট স্থাপনের কুশীবল যারা অতীতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল? জোটের তথাকথিত বড়দা কংগ্রেসের সদ্যপ্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জোটের অন্যতম নির্ভরযোগ্য শরিক বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতী সম্বন্ধে ২০০২ সালে বলেছিলেন— 'The most corrupted lady of India'। এখন অবশ্য কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সোনিয়া গান্ধী এই Corrupted lady-র corruption চর্মচক্ষে দেখতে পান না। অবশ্য জোট-রাজনীতির বাধ্য-বাধকতায় দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার অসুখে সোনিয়া গান্ধী একা আক্রান্ত নন, এই ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে মায়াবতীও মুক্তি পাননি। ১৯৯৫ সালে মুলায়ম সিংহ যাদবের সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ আনা মায়াবতী এখন সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট গড়ার সময় সেইসব অভিযোগের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। ২০০৭ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে তিনি গুন্ডামির অভিযোগ তুলেছিলেন। স্লোগান দিয়েছিলেন— 'চড় গুন্ডাকে ছাতি পর, মোহর লাগা দে হাতি পর।' সেই সমাজবাদী পার্টির সঙ্গেই আজ

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
Email : swastika 5915@gmail.com
সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com



একসঙ্গে মোদী বিরোধিতায় গলা চড়ানোয় কম যান না। কংগ্রেসের এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে যোগ দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের দয়ায় নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার শুরু করতে পারা লালুপ্রসাদ যাদব (ইন্দিরা গান্ধী প্রবর্তিত মিসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে যিনি নিজের বড়ো মেয়ের নাম রেখেছিলেন মিসা) এখন সোনিয়া-রাহুল গান্ধী ভজনায় এবং জয়প্রকাশ নমারায়ণের স্নেহধন্য সংগঠন আর এস এস-এর নিন্দায় পঞ্চমুখ। জোটের স্বার্থে সিপিএমের পিনারই বিজয়ন, কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এখন প্রায়ই একসঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেন। কে জানে তখন তাদের মনে পড়ে কিনা যে এই সোনিয়া গান্ধীর পূর্বসূরি জওহরলাল নেহরু একদা পিনারই বিজয়নের পূর্বসূরি নাম্বুদিরিপাদের নির্বাচিত সরকারকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফেলে দিয়েছিলেন। বিধাতার কী অদ্ভুত পরিহাস, তখন গোটা দেশের সমস্ত রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র যিনি নির্বান্ধব নাম্বুদিরিপাদের পাশে ছিলেন সেই স্বাতন্ত্রবীর সাভারকারের নিন্দা না করে আজকের কমিউনিস্টরা জলগ্রহণ করেন না। অবশ্য প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর সাহায্যকারীর কথা বিস্মৃত হওয়ার অসুখে যে শুধু কমিউনিস্টরা আক্রান্ত তা নয়। ত্রয়ীর আরেক অংশীদার মমতা ব্যানার্জিরও এখন এ কথা মনে পড়ে না যে এই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই একদা তার উত্থান এবং সেই সংগ্রামের সময় আজকের শত্রু বিজেপিই ছিল তাঁর একমাত্র সাহায্যকারী। এখন সকলেই উৎসুক একটি বিশেষ দৃশ্য দেখার জন্য। জোট করে ভোটে লড়ার তাগিদে কবে তৃণমূল কংগ্রেসের উপেন বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালুপ্রসাদ যাদব একই মঞ্চে পাশাপাশি অবতীর্ণ হন।

জোটগঠনকারী দলগুলির মধ্যে এমন কোনও দল কি আছে যে দলটি অন্য দলগুলির চেয়ে আয়তনে বড়ো এবং তার কর্তৃত্ব জোটের অন্য দলগুলি মেনে নেবে? বর্তমান লোকসভা সদস্যের সংখ্যা যদি মাপকাঠি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জোটগঠনকারী দলগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি বড়ো দল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং তেলেগু দেশম প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ৩৪ থেকে ৪৩-এর মধ্যেই সকলের অবস্থান। আগামী লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যার কিছু পরিবর্তন তো অবশ্যই হবে। কিন্তু কোনও একটি দলকে যদি জোটের নিউক্লিয়াস হিসেবে একক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয় তাহলে সেই দলকে একাই অন্তত দুশোর কাছাকাছি আসন দখল করতে হবে। অর্থাৎ উপরিউক্ত দলগুলির মধ্যে কোনও একটি দলকে নিজের গতবারের আসনের ৪০০ শতাংশ আসন এবারে দখল করতে হবে। একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে নির্বাচনী পার্টিগণিতে তা সম্ভব নয়।

> জোট সরকার তখনই স্থায়ী হয় যখন জোট গঠনকারী দলগুলির মধ্যে একটি আদর্শগত মিল এবং পারস্পরিক ঐক্যভাব থাকে। অথবা জোট গঠনকারী দলগুলির মধ্যে কোনও একটি দল অধিক শক্তিশালী হয় এবং তারা জোটের নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে, যদি কোনও একজন সর্বজনমান্য নেতা তাদের নেতৃত্ব দেন যাকে জোট গঠনকারী দলগুলি সবাই মান্য করে।

এমন কোনও ব্যক্তি কি বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে আছেন যিনি সকল দলমতের এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই সমস্ত দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং যার নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে সব কটি দল? কোনও একজনের নেতৃত্ব তো দূরের কথা বর্তমানে বিরোধী দলসমূহের জোটে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সংখ্যা এক ডজনের চেয়েও বেশি।

কোনও একটি বিশেষ বিষয়কে নিয়ে কি বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে? উত্তরে বলা যায়, কোনও একটি বিশেষ বিষয় তো দূরে কথা বিরোধীদের মধ্যে কোনও অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিও গৃহীত হয়নি। তা সত্ত্বেও জোট হয়। নির্বাচনে জোটই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একক শক্তিতে বলবান কোনও একটি দলের পুরো সময়কাল নিরঙ্কুশ শাসন না খণ্ড- বিখণ্ড বহুদলের জোট সরকারের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা স্বল্পকালীন শাসন কোনটা দেশের পক্ষে বেশি গ্রহণযোগ্য— সে সম্বন্ধে সাতষট্টি বছরের অভিন্ন গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি ভোটদাতারা যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। ■

বাংলার হিন্দু জমিদারদের উপর মুর্শিদকুলি খাঁ-র ভয়াবহ অত্যাচারের কিছু তথ্য

তুষার কান্তি সরকার

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বিশেষত ইংরেজ রাজত্বের শেষদিকে যে সমস্ত প্রামাণ্য আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হয়, তাতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নবাবি আমলে হিন্দু জমিদারদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ, ধর্মান্তরকরণের বিনিময়ে খাজনার দায় থেকে মুক্তি ও মালিকানা রক্ষণের তথ্য মেলে।

এমনি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ জেলা ময়মনসিংহের ইতিহাস থেকে। শ্রীকেদার নাথ মজুমদার কর্তৃক লিখিত ''ময়মনসিংহের ইতিহাস'' (১৯০৫ সনে প্রকাশিত) এবং ''ময়মনসিংহের বিবরণ'' (১৯০৭ সনে প্রকাশিত) —এমনই দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইংরেজ জেলা শাসক WILLIAM BOYD THOMSOL I.C.S-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেদার নাথ মজুমদার এই দুইটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেন। উল্লেখিত বিষয়ে শ্রীকেদারনাথ লিখেছেন, ''মুঘল শাসন সময়ে আইন-কানুনের বিশেষ প্রার্দুভাব থাকিলেও কার্যত তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কার্য্যকরী হইত। এই সময়ে দেশে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। রাজকর্মচারীরা স্ব স্ব উপার্জ্জনের চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে প্রজার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করিতেন, প্রজারা প্রাণ রক্ষার জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত।''

বৈকুণ্ঠবাস ঃ সে সময় যে কেবল প্রজারই দুর্দশার সীমা ছিল না, তাহা নহে জমিদারদিগেরও উচিত সময়ে খাজনা পরিশোধ না করিলে ''বৈকুণ্ঠবাস'' করিতে হইত। কষ্ট ও দুদ্দর্শার তুলনায় প্রজার অদৃষ্ট জমিদার অপেক্ষা শত সহস্রগুণে উত্তম ছিল। অনেক স্থলে প্রজা সর্ব্বস্ব হারাইয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া স্বাধীনভাবে যথাযথ ''গতর খাটাইয়া'' দিনপাত করিত। জমিদারদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর ছিল না। জমিদার দেশের শাসনকর্তা হইলেও রীতিমত খাজনা চালাইতে অসমর্থ হইলেই সুবাদার-কিঙ্করগণের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে নীত হইতেন এবং রাজস্ব প্রদান না করা পর্য্যন্ত অনাহারে, অল্পহারে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে, শীতকালে মারাত্মক শীতল জলে, রজনীতে উর্দ্ধদিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়া দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্তে রক্ষিত হইতেন। রেজা খাঁ (রাজস্ব আদায়কারী) হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞাছলে এই পূর্তিগন্ধপুর্ণ নরককেই ''বৈকুণ্ঠ'' নামে অভিহিত করিতেন। ''বৈকুণ্ঠ বাসের'' গুপ্ত যন্ত্রণাতেও টাকা আদায় না হইলে প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এই জীবন্ত কষ্ট ও লজ্জাতেও টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে হিন্দু জমিদারদিগকে মুসলমান বাবুর্চ্চির প্রস্তুত পোলাও অন্নের অস্বাদ গ্রহণ করিতে হইত। এই অত্যাচারের নিকট পদমর্য্যাদার বিচার ছিল না। বর্দ্ধমান সুমঙ্গ (ময়মনসিংহ) রাজাদিগকেও এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য সীতারামের ন্যায় লোকও এ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য।''



মুর্শিদকুলি খাঁ (উপরে) কাটরা মসজিদ (নীচে)।

রাজস্ব আদায়ের নিয়মের কথা উল্লেখ করে কেদার নাথ লিখেছেন---''জমিদারদিগকে রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ানখানায় কিস্তিবন্দী মতে প্রদান করিতে হইত। দেওয়ানখানা পূর্ব্বে ঢাকা ও পরে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। প্রতি কিস্তিতে জমিদারের পক্ষ হইতে একজন বা দুইজন আমলা কাগজপত্র ও টাকা লইয়া রাজধানীতে যাইতেন ও কিছুকাল থাকিয়া দেওয়ান বক্সী ও মোহরের হইতে আরম্ভ করিয়া, দপ্তরী, এমনকি খানসামাদিগেরও উদর পূরণ করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। রাজস্বের ত্রুটির জন্য জমিদারদের আমলাদিগের উপরও সময় সময় অত্যাচার করা হইতে।

মুসলিম শাসকদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁই অত্যাধিক অত্যাচারী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে ত্রিপুরা, কোচবিহার

প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপান্বিত নৃপতিরাও তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে এতদ্দেশে জমিদারী অপেক্ষা ইজারার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ইজারা প্রথা রহিত করিয়া, জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এইরূপে তিনি বঙ্গে জমিদারের পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি অনেককেই জমিদার করিলেন, কিন্তু জমিদারের মান সম্ভ্রমের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখিলেন না। জমিদারদিগের জীবনের সহিত অর্থের তুলনায় তিনি অর্থকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং রাজস্ব অনাদায়ে অত্যাচারের মাত্রা তাঁহার সময়ে অপরিমেয় ছিল।

জমিদারের প্রতি অত্যাচার ঃ বর্তমান ময়মনসিংহের জেলার তৎসাময়িক বহু জমিদার বৈকুণ্ঠবাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমনকি জাতি ধর্ম ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন।

সূর্যনারায়ণ চৌধুরী ঃ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে দশকাহনীয়ার (সেরপুর-ময়মনসিংহ) জমিদার পক্ষে রাজস্বের হিসাব লইয়া তাঁহাদিগের কর্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। নিকাশে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রসাদ কারারুদ্ধ হন। পরিশেষে জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। এই উলঙ্গ উৎপীড়নের আতিশয্যে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী ইস্তফা প্রদান করিয়া জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করেন। বাকী রাজস্ব প্রদান করিয়া জমিদারী বিনোদ নারায়ণ নামক অপর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ঃ কাগমারীর (টাঙ্গাইল) জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া কুলী খাঁর ভীষণ অত্যাচারে পৈত্রিক ধর্ম্ম পর্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ ''বৈকুণ্ঠ বাস'' ভয়ে পৈত্রিক নাম ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইনাতুল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কুলী খাঁর অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

এইরূপ অমানবিক অমানুষিক অত্যাচার যে কেবল মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েই হইত তা নহে শাসক কর্তা, তৎ সভাসদ ও পরিষদগণের চরিত্রের তারতম্যানুসারে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এইরূপ পাশব অত্যাচার বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অহরহ চিন্তাকুল রাখিয়াছিল।

রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ ঃ মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে, ঢাকা নগরে ডিপুটি গভর্নরের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তখন ঢাকায় রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। এই সময়ে সুসঙ্গ (ময়মনসিংহস্থ) রাজ্যের অনাদায় হেতু, নাবালক রাজা কিশোর সিংহ ও রাজা সিংহের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়।

কোন বিশেষ কারণে বহুদিন মুসঙ্গ রাজের নবাবী রাজস্ব বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজা রণসিংহের মৃত্যু হওয়ায় নাবালক কুমার কিশোর সিংহ সুসঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে একদা ঢাকার প্রতিনিধি শাসন কর্তার সৈন্য সামন্ত আসিয়া শিশু রাজা কিশোর সিংহ ও তৎ অনুজ ভ্রাতা রাজসিংহকে ধৃত করিয়া ঢাকা লইয়া যায়। ভ্রাতৃদ্বয় ঢাকার প্রতিনিধি শাসকর্ত্তার নিকট নীত হইলে প্রত্যেক রাজকুমারের প্রতি দশ দশ কোরা (বেত) মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। শিশুরাজাদ্বয় এই প্রাণান্তকারী আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উপায় নাই নিষ্ঠুর শাসকের ''খামখেয়াল'' প্রতিপালিত হইতেই হইবে।

প্রভুভক্ত বাঞ্ছারাম ঃ রাজাদিগের সহিত বাঞ্ছারাম নন্দী নামক একজন ভৃত্য গমন করিয়াছিল। প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য বাঞ্ছারাম নিজ পৃষ্ঠদেশে রাজাদিগের প্রতি প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। তৎকালিন নিয়মে একের দণ্ড অন্যে গ্রহণ করিতে পারিত। বাঞ্ছারামের প্রার্থনায় শিশুদ্বয় ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। ২০ কোড়া করিয়া প্রতিদিন নিরপরাধ বাঞ্ছারামের পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। বাঞ্ছারাম মৃতকল্প হইয়া তিন দিন এইরূপ ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। তথাপি রাজস্ব প্রদত্ত হইল না। ৪র্থ দিবস তোপাগ্নি মুখে শিশুরাজদ্বয়কে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তরের করিবার কঠোরতর আদেশ প্রচারিত হইল।

ইংরেজের ঢাকা অধিকার ঃ যেদিন রাজস্ব বাকীর জন্য মুসঙ্গের নাবালক জমিদারদ্বয়কে তোপাগ্নিতে, অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিবার দিন অবধারিত ছিল, সেই দিনেই অতি প্রত্যুষে ইংরেজের ভীষণ তোপধ্বনি বুড়িগঙ্গার প্রশস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া, ঢাকা নগরীতে নতুন বিপ্লব জাগাইয়া দিল।'' (সূত্র ঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস পৃঃ ৩৬ থেকে ৩৯)।

তাছাড়াও শ্রীকেদার মজুমদার তাঁর প্রণীত ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থে (১৯০৭ সনে প্রকাশিত) উল্লেখ করেছেন মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ময়মনসিংহ জেলার (ফর্মান নওকোনা জেলা) অন্যতম একটি পরগণা ছিল খালিয়াজুরি। জমিদারগণ ছিলেন হিন্দু। খাজনার জন্য মুর্শিদকুলি খা উক্ত পরগণাটি খাস করিয়া ফেলিলে, খালিয়াজুর পরগণার হিন্দু জমিদারগণের একজন মুর্শিদাবাদ যাইয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন, বিনিময়ে জমিদারী উদ্ধার করেন। (সূত্র ঃ ময়মনসিংহের বিবরন, পৃষ্ঠা—১৭)।

শুধুমাত্র ময়মনসিংহ জেলাই নয়, নবাবী শাসনে এধরনের ভয়াবহ এবং নিষ্ঠুরতম অত্যাচার এবং মর্মান্তিক ধর্মান্তরকরণ ছিল বাংলার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—যা বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা অধিকারের আগে পর্যন্ত কমবেশি তা অব্যাহত ছিল। যা ভারতের কিংবা বাংলার মূলধারার ইতিহাসে স্থান পায়নি—একদল মতলববাজ ইতিহাসবিদের ষড়যন্ত্রের কারণে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং ভণ্ড ইতিহাসবিদের রচিত ইতিহাসে এমন ঘটনার উল্লেখ তো নেইই বরং এসব অত্যাচারী নবাবদের আমলকে glorify করার জন্য নানা মিথ্যাচার আর কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করতে দেখা গিয়েছে। ■

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১১।।



বিশ্ব সেরাদের কক্ষপথে ঘুরছি : মনু ভাকের



যশপাল রানার হাত ধরে ভারতীয় শুটিংয়ের যে সাফল্যমণ্ডিত যাত্রা শুরু হয়েছিল ৯০-এর দশকে, আজ ২০১৯-এ এসে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে সেই যাত্রাপথে শুধুই মণিকাঞ্চন। একের পর এক শুটার বিশ্বমঞ্চে 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত' হয়ে বিরাজ করছে। সর্বশেষ সংযোজন মনু ভাকের ও সৌরভ চৌধুরি। দুই তরুণ-তরুণীর ঔজ্জ্বল্যে ভারতীয় শুটিং সমাজে আবার নবজাগরণের ঢেউ বইছে। এবারের সংখ্যায় মনু ভাকের তার জীবনজিজ্ঞাসাকেই যেন মেলে ধরেছেন পাঠকসকলকে।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ এত কম বয়সে এই চোখধাঁধানো সাফল্যের রহস্য কী?

মনু ভাকের : এখন আমি ক্লাস টুয়েলেভের ছাত্রী। এই বয়সে আমার শুধু শুটিং নয়, বাস্কেটবল, ক্যারাটে, বক্সিং, খোখো, কবাডি সব রকমের ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার একটা পরিশীলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মনন গড়ে উঠেছে। যা আমাকে নিজস্ব বৃত্তে অর্থাৎ শুটিংয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আজ আমি যে এশিয়া, কমনওয়েলথ ইউরোপিয় সার্কিটে এত পদক পেয়েছি তার মূলে এই সব খেলায় দক্ষতা ও গুরুত্বসহকারে চর্চা করা।

□ কীভাবে সিরিয়াস শুটিংয়ে চলে এলেন?

মনু ভাকের : হরিয়ানায় আমার পরিবারের নিজস্ব স্কুলে পড়ার সময়ে (২০১৬) বাবা একদিন বাড়ি ফিরে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন এয়ার পিস্তল। আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে অন্তত দু'বছর আমি দিন-রাত শুটিং অনুশীলন করব, অন্য সব খেলাকে একটু কম গুরুত্ব দিয়ে। আমিও তাঁর শর্ত মেনে প্রতিদিন রেঞ্জে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতাম। সেবছর শেষের দিকে হরিয়ানা রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ ও নর্থজোন প্রতিযোগিতায় নেমে পদক জিতে আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাই এবং বাবার লক্ষ্য পূরণ করার প্রথম ধাপ অতিক্রম করে যাই।

□ প্রথম বড়ো মঞ্চে সাফল্যের ব্যাপারে কিছু বলুন?

মনু ভাকের : প্রথম জীবনে তিনজন ভালো কোচের সান্নিধ্য পেয়েছি। এরা হলেন সুরেশ কুমার, নরেশ কুমার, অনিল কুমার। এদের কোচিংয়ে আমার ফান্ডামেন্টাল ও বেসিক স্কিল-টেকনিক গড়ে তুলি। ২০১৭-তে তার সুফল পেলাম। তৎকালীন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিনা। সিধুকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ফাইনালে হারিয়ে দিয়েছিলাম এয়ার পিস্তল ইভেন্টে। ওই পারফরমেন্সের পর স্বভাবতই ভালো স্পনসর পেয়ে যাই যার ফলশ্রুতি অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিকমানের একাধিক এয়ার পিস্তল, সাওনাগ্লাস, কার্তুজ আমার হাতে চলে আসে। এসব সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে এবার আমি নজর দিলাম আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের অনুসন্ধানে।

□ কমলওয়েলথ ও এশিয়াড সোনা জয়ের অনুভূতি কী?

মনু ভাকের : আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল ২০১৮ এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোষ্ট কমনওয়েলথ গেমস। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দুনিয়ার উন্নত দেশের শুটারদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগভাগি করার মহার্ঘ সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করে সোনা জয়ের যে আনন্দ তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেই বছর ইয়ুথ ইউনিভার্স গেমসে পোডিয়াম ফিনিশ করি সোনা জিতে। একাধিক ছোটো-বড়ো বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমার যা পারফরমেন্স, তা দেখে তাবড় বিশেষজ্ঞ আমার মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন, যা ভেবে যথেষ্ট গর্ব ও তৃপ্তি অনুভব করি। ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত গত এশিয়ান গেমসেও ভারতের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরেছি। চীন, কোরিয়া, কাজখাস্তান আবর আমিরশাহি শুটিংয়ে বিশ্বমানের দেশ। তাদের সঙ্গে লড়ে জেতাটাও অপার্থিব আনন্দ

□ পরবর্তী লক্ষ্য কী, কীভাবে তৈরি করছেন নিজেকে?

মনু ভাকের : অবশ্যই মহাজাগতিক সরণীতে প্রবেশ করা এবং সেই সরণী ধরে হেঁটে সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা। তার জন্য দিনে ৫-৬ ঘণ্টা অনুশীলন করছি হরিয়ানা ও দিল্লি সাইসেন্টারে। তার সঙ্গে যোগঅভ্যাস, ফিজিক্যাল ও মেন্টাল কন্ডিশনিং এমপাওয়ারমেন্ট ট্রেনিং। কোচ-ট্রেনার, মনোবিদ, নিউট্রিশন এক্সপার্ট সবাইকে নিয়ে একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। সবাই যথেষ্ট দক্ষ ও বিশ্ব শুটিংয়ের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং চরম পেশাদার। সরকার, লক্ষ্মী মিত্তল ফাউন্ডেশন সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা করছে। গত ১০/১২ বছরে ভারতবর্ষের শুটিং যেভাবে বিশ্বমঞ্চে মাথা তুলতে শুরু করেছে তাতে সমস্ত মহল থেকে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাচ্ছি যা আমাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে।

□ ভারতীয় শুটিংয়ের ভবিষ্যত কতটা উজ্জ্বল?

মনু ভাকের : যথেষ্টই উজ্জ্বল। প্রতিটা পর্বে একের পর এক প্রতিভাবান শুটার উঠে আসছে। রাইফেল ও পিস্তল দু-বিভাগেই দাপট দেখাচ্ছে ভারতীয়রা। সৌরভ চৌধুরি, অঙ্কিত শর্মা, মেহুলি ঘোষ, হিনা সিঁধু সহ আরো অনেক টপক্লাস শুটার দেশে-বিদেশে জয় পতাকা উড়িয়ে চলেছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিটে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যারা যে কোনো সময়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে খেতাব জিততে পারেন। এরা হয়তো বিশ্বকাপ জিতেছেন কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারেননি। তা হয়তো এবছর হয়েও যেতে পারে। যে দেশ থেকে অতীতে সব বড়ো বড়ো শার্প শুটার উঠে এসেছে, তা কি কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। ▌

অন্য রকম

ফোটোগ্রাফি থেকে বনসৃজন
পম্পায়া মালেনাথের অসাধ্য সাধন



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্ণাটকের পম্পায়া মালেনাথ ছিলেন ফোটোগ্রাফার। আরও স্পষ্ট করে বললে ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার। সারা পৃথিবীর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বন্যপ্রাণীর ছবি তুলতেন। সেই ছবি ছাপা হতো বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায়। জীবন ছিল সহজ, স্বাভাবিক। কিন্তু এই সহজ জীবনকে পিছনে ফেলে তিনি হাত দিলেন বনসৃজনে। এবং তাঁর ছোঁয়ায় জঞ্জাল ফেলার এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর হয়ে উঠল ঘন সবুজ অরণ্য।

জায়গাটার নাম কমলাপুর। পম্পায়ার গ্রামের বাড়ি হসপেট থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে। কমলাপুরের গা-ঘেঁষে বয়ে গেছে একটি খাল। এখন যদি কেউ ওই খালের ধারে যান তা হলে তার চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ বনভূমি। কয়েক বছর আগেও যা ছিল কল্পনা মাত্র। পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমাল চাপা দিতে হতো।

আগেই বলেছি পম্পায়া ছিলেন পেশাদার ফোটোগ্রাফার। তাঁর ফোটোগ্রাফির শখ ছেলেবেলা থেকে। শখটা প্রায় নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল দারোজী স্লথ বিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারিতে স্বেচ্ছাসেবককের দায়িত্ব পাওয়ার পর। এ ব্যাপারে পম্পায়া বলেন, ‘সে সময় এমন কোনও কাজ ছিল না যা আমি করিনি। তবে সব কাজের মধ্যে প্রধান ছিল ফোটোগ্রাফি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতেই বন্যপ্রাণীদের নাম জানলাম। তবে স্যাঙ্কচুয়ারির গবেষক এবং অন্য কর্মীদের কথা বলতেই হবে। জঙ্গল এবং জংলি প্রাণীদের প্রতি ওদের আবেগ এবং দায়বদ্ধতা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বলা ভালো, ওদের দেখেই আমি জঙ্গলকে ভালোবাসতে শিখেছি।’

পেশার প্রয়োজনে পম্পায়া হসপেটের গ্রামের বাড়িতে থাকতে শুরু করলেন। বাড়ির পাঁচিলের লাগোয়া বিশাল পতিত জমি। স্থানীয় মানুষজন সেখানে জঞ্জাল ফেলেন। অদূরে একটি খাল। একদিন জঞ্জালে ভরা জায়গাটি দেখতে দেখতে পম্পায়ার মাথায় একটি আইডিয়া এল। যদি ওই পতিত জমিতে বনসৃজন করা যায় তাহলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন তুঙ্গভদ্রা বোর্ডকে। জবাব এল কয়েকদিনের মধ্যেই। কী জবাব দিয়েছিল বোর্ড পম্পায়ার মুখেই শোনা যাক, ‘আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করল বোর্ড। তবে একটা শর্তে। আমি কোনওদিন ওই জমির মালিকানা দাবি করতে পারব না। কারণ ওই জমি সরকারি সম্পত্তি। আমি অবশ্য মালিকানা- টালিকানার কথা ভাবছিলাম না। আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। আমাদের গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন জমিতে চাষ করতে গিয়ে দেখেছি জমি একেবারেই উর্বর নয়। সুতরাং ওই পতিত জমিতে গাছপালা লাগালে বাঁচবে তো?’

যাই হোক, অঘটন কিছু ঘটেনি। পম্পায়া বলেন, ‘আমার প্রথম কাজ ছিল জমিটিকে সম্পূর্ণ জঞ্জালমুক্ত করা। তারপর মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলো। রিপোর্ট এল মারাত্মক খারাপ। দু’ ইঞ্চি মতো খুঁড়ে ওপরের মাটি ফেলে দিতে হলো। নীচের মাটি অসাধারণ। মাটি ভালো করে চৌরস করে বৃক্ষরোপণ শুরু করলাম।’

পম্পায়ার একটা মস্ত সুবিধে তিনি কমলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। যার ফলে বনসৃজন এবং ভূমি সংরক্ষণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজ করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। বনসৃজনের উদ্যোগ নেওয়ার পর যোগাযোগ ঘটল বনদপ্তরের সঙ্গে। পম্পায়ার উৎসাহ দেখে বনদপ্তরের কর্তারা তাকে বিনামূল্যে নানা ধরনের চারা দিয়ে সাহায্য করেছেন। পম্পায়া অকুণ্ঠ চিত্তে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। কমলাপুরের জঙ্গলে যে টিক, সিলভার ওক এবং মেলিয়া দুবিয়া জাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়, সেসব বনদপ্তরের কর্তারাই দিয়েছেন। এর পাশাপাশি পম্পায়া আম এবং পেয়ারার মতো ফলের গাছ বসিয়েছেন। রয়েছে সিঙ্গাপুর চেরির মতো ঘন পাতা আর ডালপালার গাছ। উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্ত মানুষ এবং বন্যপ্রাণীদের ছায়া দেওয়া।

সত্যিই অসাধ্যসাধন করেছেন পম্পায়া। প্রকৃতির বুকে ফিরিয়ে এনেছেন সবুজ। এর জন্য স্থানীয় মানুষ তার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অনেক মানুষ পম্পায়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এগিয়ে আসবেন। আমাদের দেশ সেজে উঠবে সবুজে সবুজে। ▮



‘কেন আমরা ভারতভূমিতে এলাম’

চন্দন রায়

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছিল আমার সোনার বাংলা, পূর্ববাংলা। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গোরু, পুকুর ভরা মাছ। ছায়া সুনিবীড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি। এটাই আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি সাত পুরুষের ভিটা অধুনা বাংলাদেশ। জমিদার তার জমিদারি ছেড়ে, ব্যবসায়ী তার বাণিজ্য-লক্ষ্মী ব্যবসা ফেলে, কৃষক তার ফসল ভরা মাঠ ত্যাগ করে, খেটে খাওয়া গরিব হিন্দু তার পর্ণকুটিরের মায়া ত্যাগ করে চোখ ভরা জল নিয়ে সর্বস্বান্ত নিঃস্ব হয়ে এক কাপড়ে অনিশ্চয়তার পথে ভিখারি বেশে ভারতভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্বাস্তু হয়ে সোনার বাংলা ছেড়ে ভারতের ভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যের বিপদসংকুল গভীর জঙ্গল, মরুপ্রান্তর, সমুদ্রবেষ্টিত সুদূর দ্বীপ ভূখণ্ডে তাদের আশ্রয় হয়েছে। বিগত ৫০ বছর ধরে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছি। কেন কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে অনিশ্চয়তার উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিল? কেন আমরা পূর্ববাংলা ছেড়ে ভারতভূমিতে এলাম।

এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ছুটে গিয়েছি জমিদারি হারানো জমিদারবাবুর কাছে। আপনাদের পূর্ব বাংলায় কয়েক পরগনা জুড়ে জমিদারি স্বত্ব, প্রাসাদসম অট্টালিকা, দোল-দুর্গোৎসবের জন্য প্রকাণ্ড নাটমন্দির। সারা বছর উৎসব উপলক্ষ্যে সবার জন্য উন্মুক্ত দরজা। অন্ন ও জলসত্র সর্বসাধারণের জন্য সব সময় খোলা। অতি বন্যা ও খরার কারণে গরিব হিন্দু মুসলমান সব কৃষকদের জমির কর মকুব করেছেন। ধন্য ধন্য পড়েছে চারিদিকে। আপনার পৃষ্ঠপোষকতা ও দানে কত বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে। একদিকে আপনি ছিলেন যেমন দয়ালু, অন্যদিকে আপনার দাপটে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। এত দয়ালু ও ক্ষমতাশালী হওয়া স্বত্বেও আপনারা নিজ জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে কেন এলেন? একই প্রশ্ন রেখেছি দেশত্যাগী ব্যবসায়ীর কাছে। আপনার গুদাম ভর্তি মাল, ছোটো ছোটো গরিব হিন্দু-মুসলমান, ব্যবসায়ী ক্রেতা উপকৃত হয়েছে আপনার সহৃদয় ব্যবহারে। কত ঋণ বাকি ছেড়ে দিয়েছেন আপনি। তবুও আপনি ভারতে চলে এলেন কেন?

আমি উত্তর খুঁজতে ছুটে গিয়েছি মহান জ্ঞান তাপস উদ্বাস্তু শিক্ষকমশাইয়ের কাছে। অর্থনৈতিক অভাবকে তুচ্ছ জ্ঞানে ছুড়ে ফেলে গ্রামের গরিব হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল গড়ে তুলেছেন। ওই স্কুলই ছিল আপনার সকল ধ্যান জ্ঞান। আপনিও ভারতে এলেন! আমি উত্তর খুঁজেছি উদ্বাস্তু স্বনামধন্য ডাক্তার ও কবিরাজ মশাইয়ের কাছে। কত মুসলমান গরিব রুগিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছেন। দিন নাই, রাত নাই রুগিদের কাছে ছুটে গেছেন। আপনি তাদের কাছে ভগবান ছিলেন। আপনাকেও তারা কেন তাড়িয়ে ছিল? আমি প্রশ্ন রেখেছি স্বদেশী গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশ ত্যাগী নেতার কাছে। আপনিও ছিলেন গান্ধীজীর অহিংস ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পূজারি। আপনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আপনি কেন আপনার জন্মভূমি গ্রামের কংগ্রেসের পতাকা গুটিয়ে ভারতে পালিয়ে এলেন?

উত্তর খুঁজেছি নাস্তিক কমিউনিস্ট নেতার কাছে যিনি হিন্দুর সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করেন। খাঁটি কমিউনিস্ট হয়ে গর্বের সঙ্গে গো-মাংস ভক্ষণ করেন। তেভাগা আন্দোলনে হিন্দুর জমির ফসল কেড়ে মুসলমানদের মধ্যে বিলি করেছেন। কখনও কখনও মুসলমান নামে পরিচিত হয়েছেন। আপনারা তো পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন! আপনাদের

আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে পেরেছি, কিন্তু ধর্মের নামে আপোশ করিনি। ধর্ম ত্যাগ করতে পারিনি। এটাই আমাদের ধর্ম, এটাই আমাদের কর্ম, এটাই আমাদের হিন্দুত্ব আর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্যই আমার সোনার বাংলা ত্যাগ করে ভারতভূমিতে পালিয়ে এলাম।

ফঃ ৬

অপরাধ কী ছিল? কেন কমিউনিস্ট নেতারা দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গাড়লেন। আপনাদের সাধের পূর্ব পাকিস্তানে একটু জায়াগা হলো না!

আমি একই প্রশ্ন রেখেছি তথাকথিত দলিত, অ-দলিত ধর্মগুরুদের কাছে। যাঁদের কাছে আল্লা ভগবান এক। হিন্দু মুসলমান সব ভক্তদের কাছে গুরুগম্ভীর ভক্তি-ভালোবাসা-সেবার বাণী শুনিয়ে বেড়াতেন। হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্য ছিল আপনাদের। তাদের ফেলে রেখে আপনারা সব ধর্মগুরু চলে এসে ভারতে নিরাপদ স্থানে আবার মন্দির ও আশ্রম গড়ে তুলে সেকুলার সেজে বসেছেন। কেন পূর্ববঙ্গে আপনাদের ভালোবাসার প্রেমবাণী কেউ শোনেনি? আপনারাও দেবভূমি ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি উত্তর খুঁজেছি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা ছাত্র-যুবার কাছে। মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী সকল আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগহণ করে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন। একজন বাঙ্গালি হিসেবে গর্বে বুক ফুলিয়েছেন। আপনিও সাধের সোনার বাংলা ছেড়ে ভারতে চলে এলেন? এলোমেলো জবাব পেয়েছি। মনমতো জবাব পাইনি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি— কেন এলাম। ঢাকার রাজপথে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। রমনাপার্কে বটমূলে নববর্ষের প্রথম প্রভাতে গান গেয়েছি। চারুকলার বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছি বা ২১ ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে গলা মিলিয়েছি। বাংলার গর্ব শহিদবেদিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি। তবুও আমি বাংলাদেশে থাকতে পারিনি। দেশত্যাগী হতে হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়ে ভারতে নাগরিকত্ব বিহীন উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে হয়েছে। বছর বছর ধরে আমরা মালিকানাহীন রেললাইনের ধারে, খাল পাড়ে অথবা বস্তিবাসী হয়ে অবহেলায় ও সামাজিক অবজ্ঞার একরাশ অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছি।

দলিত, অ-দলিত, উচ্চ, মধ্য, নিম্নবর্ণ কমিউনিস্ট অ-কমিউনিস্ট কংগ্রেস জমিদার ব্যাপারী, কৃষক পণ্ডিত, মাস্টার ডাক্তার বৈদ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানী গুণী সবাই এখন পূর্ববাংলার ভিটে মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ ভূমিতে আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবনে নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত। দেশত্যাগী কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা হাতে আর কমিউনিস্ট তার লাল ঝান্ডায়, মাস্টারমশাই ছাত্রবেষ্টিত গুরু তার শিষ্য আবৃত, কিন্তু আমরা কেন এলাম ভারতে তা যথার্থ উত্তর খুঁজে পাইনি এখনও।

মোটামুটি সবার উত্তরের মূলকথা ইসলামি দেশে হিন্দু সমাজের ওপর বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা আর হিন্দু বিরোধী রাজনীতির ছত্রছায়ায় হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুঠপাঠ, অগ্নিসংয়োগ, শারীরিক নির্যাতন, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন, এমনকী প্রাণে মারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। এগুলি উত্তর হলেও আমি সঠিক যথার্থ মৌলিক কারণ বলে মেনে নিতে পারিনি।

পৃথিবীর বিভিন্ন পান্তে প্রাচীন সনাতন ধারার মানুষের উপর ইসলামি শাসকদের নির্যাতন, অত্যাচার লুঠতরাজ, ধর্ষণ এবং হত্যালীলার ইতিহাস প্রচারের আলোয় স্থান পায় না। ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়ায় প্রাচীন সনাতন ইয়াজিদি সম্প্রদায়, ইরান অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের পার্শি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী, আরবের প্রাচীন ইহুদি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী, আফগানিস্তান তথা গান্ধার দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ— এই সমস্ত প্রাচীন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিদেশি আক্রমণকারী মুসলমান শাসকদের অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ এবং ধর্ষণ ও হত্যার কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। বাকি স্বল্পসংখ্যক আত্মগরিমায় নিজস্ব ধর্ম, সামাজিক সংস্কার ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য নিজের প্রাচীন মাতৃভূমি ত্যাগ করে দেবভূমি ভারত ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে এবং পৃথিবীর বুকে নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে। ইয়াজিদি সম্প্রদায় আজও উগ্র ইসলামি জঙ্গিদের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই করে চলেছে। ভারতভূমিও তার ব্যতিক্রম নয়।

হাজার বছর মুসলমান শাসনে কোটি কোটি হিন্দু ভারতবাসী ইসলাম মেনে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে। যারা ইসলাম স্বীকার করেনি তারা শত অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেছে। হিন্দু নারীরা সম্মান রক্ষায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত করেছে। ভারতীয় সাধুসন্তের আপোশহীন আত্মত্যাগের ও শত নির্যাতন অত্যাচার সত্ত্বেও আজও ভারতের দেবভূমিতে হিন্দু সমাজ প্রাচীন শাশ্বত সনাতন ধর্মের ধ্বজা সংস্কৃতি বহন করে চলেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ লগ্নে পৌঁছে ভারতবর্ষের মুসলমানরা জঙ্গি আন্দোলনের ফল স্বরূপ পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়েছে। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উপর পুনরায় ভয়ঙ্কর চরম অত্যাচার নিপীড়ন মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন, বিষয় সম্পত্তি লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, এমনকী হত্যালীলা নেমে এলো। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সাধের সাজানো সংসার, আটশো বছরের হানাদার ইসলামি শাসক ও তাদের অনুসারীদের শত অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে পূর্ববাংলার প্রাচীন হিন্দু সমাজ তাদের গর্বের সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি সংস্কার আচার অনুষ্ঠান লালন পালন করছিল তা পুনরায় ধ্বংস ও অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁছাল।

শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের লালিত সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি, সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান রক্ষার জন্য হাজার বছরের পূর্বপুরুষের ভিটের মায়া ত্যাগ করে সর্বস্বান্ত হয়ে অনিশ্চয়তার পথে ভিখারিবেশে ভারতভূমিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলে তাদের এত শারীরিক মানসিক ও অর্থনৈতিক বিশাল ক্ষতি সাধন হতো না, কিন্তু আমাদের ধমনীতে মুনি ঋষিদের রক্ত, তাই সবকিছু ত্যাগ করতে পেরেছি, কিন্তু ধর্মের নামে আপোশ করিনি। ধর্ম ত্যাগ করতে পারিনি। এটাই আমাদের ধর্ম, এটাই আমাদের কর্ম, এটাই আমাদের হিন্দুত্ব আর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্যই আমার সোনার বাংলা ত্যাগ করে ভারতভূমিতে পালিয়ে এলাম। ■

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রভাব

স্বপ্নময় মুখোপাধ্যায়



সদ্য সমাপ্ত লোকসভায় ২০১৯-২০'র অন্তর্বর্তী বাজেট পাশ হয়েছে। এই বাজেটে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাজেট ঘোষিত পদক্ষেপগুলি বিগত চার বছরে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারই প্রতিফলন। আলোচ্য সময়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবন কতখানি সহজ হয়েছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির হার লক্ষণীয়ভাবে কমে যাওয়ায় এবং জিএসটির ফলে কার্যকর কর-হার হ্রাস পাওয়ার দরুন সঞ্চয়কারী এবং গ্রাহকদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে।

সাধারণ নাগরিকের ওপর মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। ২০১৩-১৪'তে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল যেখানে ১০.১ শতাংশ, তা ২০১৮-তে লক্ষণীয়ভাবে কমে ২.২ শতাংশে পৌঁছেছে। মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত প্রভাব বুঝতে গেলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির কী প্রভাব রয়েছে। ২০১৪ সালে ১ কিলোগ্রাম চালের দাম যদি ৫০ টাকা হয় এবং বিগত পাঁচ বছর ধরে যদি মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কেই বজায় থাকে, তা হলে আজ কিলো প্রতি চালের দাম বেড়ে হতো ৮০ টাকা। একইভাবে এই পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৯) মুদ্রাস্ফীতির গড় হার যদি ৪.৫ শতাংশে বজায় থাকতো, তাহলে আজ ১ কিলোগ্রাম চালের দাম হতো ৬২ টাকা ৫০ পয়সা। তাহলে একটি পরিবার যার মাসিক খরচ ক্ষমতা ৫ হাজার টাকা, সেই পরিবারটি বর্তমানে ৮০ কিলোগ্রাম চাল কিনতে পারতো। অবশ্য, মুদ্রাস্ফীতির হার যদি ২০১৪'র সময়কালের সঙ্গে একই থাকতো, সেক্ষেত্রে পরিবারটি বর্তমানের ৮০ কিলোর পরিবর্তে ৬২.৫ কিলোগ্রাম চাল কিনতে পারতো। স্বাভাবিকভাবেই একথা বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির কম হার পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতা প্রায় ২৮ শতাংশ বাড়িয়েছে। একটি পরিবার সার্বিকভাবে যে সকল পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে থাকে, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে পরিবারটিরও সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। এবারের বাজেটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে এই বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সঞ্চয়ের প্রকৃত হারেও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে। ২০১৪ পর্যন্ত যখন মুদ্রাস্ফীতির হার দুই অঙ্কে ছিল, তখন একজন সঞ্চয়কারীর বার্ষিক উপার্জনের পরিমাণ ২ শতাংশ কমেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই পরিস্থিতিতে স্থায়ী আমানতে একজন ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ, তাঁর ক্রয়-ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। বিগত চার বছরে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার প্রায় ৪ শতাংশে বজায় থাকায় সঞ্চয়ের প্রকৃত হার প্রায় ৩ শতাংশ বেড়েছে, যা প্রকৃত অর্থে প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। মুদ্রাস্ফীতির হার যদি ২০১৪ সালের মতো একই থাকতো, তাহলে সঞ্চয়কারীরা বর্তমানে যে হারে সঞ্চয় করছেন, তার তুলনায় ক্রয় ক্ষমতা প্রায় ২৫ শতাংশ কমে যেত। একইভাবে, প্রবীণ নাগরিক, যাঁরা অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্ত অর্থের স্থায়ী আমানতের মাধ্যমে সুদের ওপর নির্ভর করেন, তাঁদেরও ক্রয় ক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর প্রদান করেন এবং কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতির পাশাপাশি, আয়কর দাখিলের পর যে রিফান্ড পেয়ে থাকেন, তা সবই লাভবান হওয়ার মূল উৎস। এবার, জিএসটির প্রভাব বিচার করা যাক। একটি পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের খরচের ওপর এই কর ব্যবস্থা লাগু হওয়ার পূর্বে ও পরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর ক্ষেত্রে কর হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। আমরা যদি একথা ধরে নিই যে, একটি পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-ক্ষমতা যদি মাসিক ৮ হাজার ৪০০ টাকা হয়, তা হলে জিএসটির আওতায় প্রদেয় করের পরিমাণ ৩২০ টাকা কমেছে। করের ওপর কর আরোপ দূর হওয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

গ্রাহকরা অধিকাংশ সময়েই একটি পণ্যের ওপর মুদ্রিত জিএসটি হারের দিকে নজর দেন এবং মনে করেন যে, কার্যকর কর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য, মনে রাখতে হবে মূল্য যুক্ত ব্যবস্থার ওপরেই কেবল জিএসটি প্রদান করা হয়। তাই গ্রাহকদেরকে জিএসটি হারের পরিবর্তে জিএসটির আওতায় প্রকৃত হারে প্রদেয় করের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

কার্যকর কর হার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি, কর দাখিল ব্যবস্থাতেও সরলীকরণ করা হয়েছে, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ অনলাইনে সহজেই কর দাখিল করতে পারেন এবং দ্রুত রিফান্ড পেতে পারেন। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে ৯৯.৫৪ শতাংশ রিটার্ন যন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এতে যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও পক্ষের ভূমিকা থাকবে না। এর ফলে, সাধারণ মানুষের কাছে কর মান্যতা আরও সহজ হয়ে উঠবে। কর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি সহজে কর দাখিল ব্যবস্থায় এক নতুন ব্যবস্থার সূচনা করবে। এর ফলে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রদেয় কর যাচাই এবং প্রাপ্য রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

সর্বোপরি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য বাজেটে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা কর কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- স্বরূপ, পাঁচ বছর ধরে যার নক্শা তৈরি করা হয়েছে। ■

মহারাষ্ট্রে শিবসেনা এবং বিজেপির নির্বাচনী বোঝাপড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের দুই প্রধান স্তম্ভ শিবসেনা এবং বিজেপির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নানারকম মিথ্যা প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিল সর্ব



ভারতীয় মিডিয়ার একাংশ, কিন্তু কোনও প্রচারই শেষপর্যন্ত কাজে এল না। শিবসেনা-প্রধান উদ্ধব থাকরের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ্ একসঙ্গে চলার কথা ঘোষণা করলেন। অমিত শাহ্ জানালেন রামমন্দির নির্মাণে দুই দলের দায়বদ্ধতার কথা। জোর দিলেন মহারাষ্ট্রের কৃষক সমস্যার সমাধান এবং মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ ও নগরোন্নয়নের ওপর। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে আয়োজিত এক জনসভায় শিবসেনা প্রধান উদ্ধব থাকরে বলেন, 'আমরা দুই দল দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা যখন রামরাজ্যের কথা বলি, তখন রামমন্দির নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করি। শিবসেনা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার চাষিদের ঋণমকুবের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু ভুল সিস্টেমের জন্যেই চাষিদের এত সমস্যা।' তিনি আরও বলেন, 'বিরোধীরা শিবসেনা-বিজেপিকে হারাবার দিবাস্বপ্ন না দেখলেই ভালো করবে।'

দুই দলের মেলবন্ধনকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বালাসাহেব থাকরের আদর্শে অনুপ্রাণিত দুটি দল মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে আবার একসঙ্গে কাজ করবে। দুই দলের জোট হওয়ার ফলে আগামী লোকসভা নির্বাচনের পর দেশ একগুচ্ছ উন্নয়নমুখী, সৎ এবং দেশপ্রেমিক সাংসদ লড়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এনডিএ জোটকে শক্তিশালী করবে।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেন, 'বিজেপি এবং শিবসেনা একসঙ্গে নির্বাচনী যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর থেকে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না। আমি নিশ্চিত, এই যুদ্ধে আমরাই জিতব এবং নরেন্দ্র মোদী আবার দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।'

মহারাষ্ট্রে বিজেপি এবার ২৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অন্যদিকে শিবসেনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ২৩টি আসনে। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে দুই দল সমসংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুম্বই এবং থানে শহরে যাদের বাসস্থান ৫০০ স্কোয়ার ফুটের নীচে তাদের সম্পত্তি কর মকুব করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে বিজেপি এবং এ আই এ ডি এম কে জোট গঠন করেছে। ঠিক হয়েছে, ওই রাজ্যে বিজেপি ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ আই এ ডি এম কে লড়বে ৩৭টি আসনে।

ভারতের প্রথম ফুলডোম থ্রি-ডি ডিজিটাল থিয়েটার উদ্বোধন করলেন ডাঃ মহেশ শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আজ সায়েন্স সিটি-তে ভিডিও কনফারেন্সিং- এর মাধ্যমে ফুলডোম থ্রি-ডি ডিজিটাল থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মহেশ শর্মা। দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা এই প্রথম। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এই স্পেস থিয়েটারটিতে টু-ডি সেলুলয়েড প্রোজকশন ব্যবস্থা নিয়ে আসা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক স্পেস থিয়েটারটি গড়ে তোলার জন্য যে ২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, তা এসেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে।

স্পেস থিয়েটারটি উদ্বোধন করে ডাঃ শর্মা বলেন, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিশুরা এই থিয়েটারে এসে বিনামূল্যে সিনেমা দেখতে পারবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এবং দেশের জনসাধারণের কাছে যাতে সহজে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য প্রস্তুত। মন্ত্রী এও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি হলো এই অত্যাধুনিক স্পেস থিয়েটার তৈরি।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের মহানির্দেশক এ ডি চৌধুরীও অনুষ্ঠানে এই অত্যাধুনিক প্রোজেকশন ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ, ৩৬০টি আসনের এই স্পেস থিয়েটারে টু-ডি এবং থ্রি-ডি ছবি দেখানো হবে, নিয়মিতভাবে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। সাধারণ দর্শকদের জন্য টু-ডি শো-এর টিকিটের দাম স্থির করা হয়েছে ১০০ টাকা। থ্রি-ডি শো-এর জন্য এই মূল্য ১২০ টাকা। ২০ জনের বেশি দর্শক হলে টু-ডি শো-এর জন্য ৮০ টাকা এবং থ্রি-ডি শো-এর জন্য ১০০ টাকা লাগবে। কোনও বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা শো দেখতে এলে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যদি তারা চিঠি নিয়ে আসে, তাহলে এই টিকিটের দাম টু-ডি শো-এর জন্য পড়বে ৪০ টাকা এবং থি-ডি শো-এর জন্য ৫০ টাকা।

বিহারে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিহারের পরিকাঠামো, শক্তি নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিকাশের জন্য এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বারাউনিতে প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। বিহারের রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডন, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পগুলির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী একটি বোতাম টিপে ডিজিটাল মাধ্যমে পাটনা মেট্রো রেল প্রকল্পের শিলনান্যাস করেন। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৩,৩৬৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের দুটি করিডর থাকবে। একটি দানাপুর থেকে মিঠাপুর এবং অপরটি হবে পাটনা রেলস্টেশন থেকে নতুন আই এস বি টি পর্যন্ত। দুটি প্রকল্পের কাজ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে, পাটনা ও নিকটবর্তী এলাকার মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে জগদীশপুর-বারাণসী প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের অন্তর্গত ফুলপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত অংশের উদ্বোধনও করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তিনিই এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। তিনি আরও স্মরণ করেন, এটি এমনই একটি প্রকল্প যেটির শিলান্যাসও তিনি করেছিলেন এবং সূচনাও তিনিই করছেন। তিনি বলেন, ''এই প্রকল্পের ফলে পাটনার বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহের পাশাপাশি বারাউনি সার কারখানা এবং স্থানীয় অন্যান্য কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে।'' পাস-ভিত্তিক এই প্রকল্পের ফলে স্থানীয় এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এই অঞ্চলের ওপর অগ্রাধিকারের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''পূর্ব ভারত এবং বিহারের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

বিহারে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দিনটি ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। ছাপড়া এবং পুর্নিয়াতে নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হবে। গয়া এবং ভাগলপুরের মেডিকেল কলেজগুলিকে আরও উন্নত করা হবে। তিনি আরও বলেন, পাটনায় এইম্‌স স্থাপন করা হয়েছে। মানুষের চাহিদা মেটাতে রাজ্যে আরও একটি এইম্‌স গড়ে তোলা হবে।



প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের আওতায় বারাণসী, ভুবনেশ্বর, কটক, পাটনা, রাঁচি এবং জামশেদপুরকে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হচ্ছে। পাটনায় প্রধানমন্ত্রী পাটনা সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্পেরও সূচনা করেন। এর মাধ্যমে পাটনা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিশেষ করে, পাটনা এবং নিকটবর্তী এলাকায় শক্তির সরবরাহ সুনিশ্চিত হবে।

দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এনডিএ সরকারের দ্বিমুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, যাঁরা বিগত ৭০ বছর ধরে ন্যূনতম সুযোগ- সুবিধার জন্য লড়াই করে আসছেন।''

প্রধানমন্ত্রী পাটনায় নদী বিকাশ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন। তিনি ৯৬.৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ করমালিচক নিকাশি ব্যবস্থারও শিলান্যাস করেন। এই নিকাশি ব্যবস্থার আওতাধীন বাঢ়, সুলতানগঞ্জ এবং নওগাছিয়ায় প্রকল্পের তিনি সূচনা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ২২টি অম্ভুত প্রকল্পেরও তিনি সিলান্যাস করেন।

পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে শোক, দুঃখ এবং ক্রোধের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুন আমিও অনুভব করছি। পুলওয়ামায় বিস্ফোরণে বিহারের পাটনার শহিদ হওয়া কনস্টেবল সঞ্জয় কুমার সিনহা এবং ভাগলপুরের শহিদ রতন কুমার ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানান।

আলোচনা নয় এখন অ্যাকশন নেবার সময় : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পরেও যারা পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পক্ষপাতী তাদের কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'কথা বলার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চায়। একটি অনুষ্ঠানে, ভারত সফররত আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মরিসিও মাসরির উপস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'পুলওয়ামায় সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর হামলার পর আলোচনার আর কোনও অবকাশই নেই। এখন সারা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক দেশগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। জঙ্গি এবং জঙ্গিদের সমর্থক দেশগুলির প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করারই নামান্তর।' নরেন্দ্র



মোদীর এই বার্তা সৌদি আরবের রাজপুত্র মহম্মদ বিন সালেমের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইসলামাবাদে আরবের রাজপুত্র বলেন, 'প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বাড়তে থাকা টেনশন দূর করাই আমাদের লক্ষ্য। দুই দেশের মতপার্থক্য যাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করা যায় তার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত।' নরেন্দ্র মোদী আরবের রাজপুত্রের কথা মাথায় রেখেই বলেন আলোচনা করার মতো সময় এখন ভারতের হাতে নেই। এখন অ্যাকশন নেবার সময়। এই কথা বলে তিনি সৌদি রাজপুত্রের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। এদিকে, সৌদি-রাজপুত্রের পাকিস্তান সফর নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তিনি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। এর থেকে অনেকে মনে করছেন ভারতের জইশ-নেতা মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণার দাবি সৌদি আরব সমর্থন করবে না।

রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল উচ্চ গতির ট্রেন নিয়ে রাহুল গান্ধীকে তুলোধোনা করলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লি ও বারাণসীর মধ্যে চলাচলের জন্য নির্ধারিত 'বন্দে ভারত' নামের দ্রুত গতির ট্রেনটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরে কুয়াশার কারণে দেড় ঘণ্টা বিলম্বিত হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এ নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। ট্রেনটি দুটোর পরিবর্তে বারাণসীতে ৩-২৫ মিনিটে পৌঁছয়। দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পথেও ট্রেনটি কিছুটা বিলম্বিত হয়। রেলমন্ত্রকের এক আধিকারিক জানান দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অনেক সময়ই সঠিক সময়ে ট্রেনের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করে। যাত্রী নিরাপত্তা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয়। সেই হিসেবে ট্রেনটি অত্যন্ত মসৃণভাবে চলেছে। কোনো কোনো স্থানে ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ট্রেনটি দৌড়েছে বলে খবর।

রাহুল গান্ধীর অপরিণামদর্শী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রী জানান যে, কংগ্রেস প্রধান



তাঁর বিদ্রূপের মাধ্যমে সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী রেল দপ্তরের কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার যারা নিরলস প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে 'বন্দে ভারত' ট্রেনটি তৈরি করেছেন তাঁদের সকলকে অপমান করেছেন। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি যেভাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পকে ব্যঙ্গ করেছেন তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে রাহুল গান্ধীর এমন অসত্য অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বলেন রায়বেরিলির দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কোচ নির্মাণের কাজ এই সরকার বাস্তবায়িত করেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি থেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তি নির্ভর ট্রেন উৎপাদন কয়েক যুগ পরে আজ রূপায়ণের আলো দেখছে। দেশকে আশ্বস্ত করে রাহুল গান্ধীর অহেতুক বিদ্রূপকে পাত্তা না দিয়ে রেলমন্ত্রী বলেন অদূর ভবিষ্যতে এই ট্রেন ১৮০ কিলোমিটার বেগে ছুটবে।

রণিদার গোয়েন্দা কাহিনি পাঠকদের ভালো লাগবে



পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে গল্প উপন্যাস কবিতা নাটকের মতো গোয়েন্দা কাহিনিও তার জায়গা করে নিয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনির পাঠক-পাঠিকা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ গল্প-উপন্যাসের চেয়ে বেশি। তাই দেখা গেছে প্রচুর লেখক গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে গোয়েন্দা গল্প লিখছেন। এর কারণ গোয়েন্দা গল্পে টান-টান উত্তেজনা থাকে। এর পর কী হবে, সত্যিকার অপরাধী ধরা পড়বে কখন— এই চিন্তা পাঠক-পাঠিকাকে পেয়ে বসে। গোয়েন্দার সঙ্গে তাঁরাও মস্তিষ্ক চালনা করেন। বিপ্লব মজুমদার লিখিত রণিদা রহস্য ট্রিলজি পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকারও সেই দশা। উদ্দিষ্ট গ্রন্থে তিনটি ভিন্নধর্মী গোয়েন্দা গল্প আছে। গল্পগুলি হলো— সুন্দরগড় সাসপেন্স, লকার রহস্য ও মার্ডার ইন ভিক্টোরিয়া। তিনটি গল্পের গোয়েন্দা হলেন রণজয় চক্রবর্তী, তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন সুরঞ্জন দে আর ঢোলগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক এঁদের প্রত্যেকের চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে এঁকেছেন।

রণজয় চক্রবর্তী, অর্থাৎ রণিদা মাত্র ৩২ বৎসর বয়সী। এত অল্প বয়স হলে হবে কী হবে তিনি খুব তিনি খুব সূক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন। তাঁর নীতি হলো— জাস্ট ডোন্ট সি, ট্রাই টু স্ক্রুটিনাইজ। এই নীতির বলে তিনি রহস্য যত কঠিন হোক তাঁর সমাধান করেন। সুরঞ্জন সংক্ষেপে রঞ্জন রণিদার বিশেষ বশংবদ। তিনি রণিদার সঙ্গে হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে রণিদাকে সাহায্য করেন। তিনিও ধীসম্পন্ন ও হাসি-খুশি। রণিদার তৃতীয় সহায়ক ঢোলগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কমিক চরিত্র। তিনি এঁদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তাঁর বয়স বাহান্ন। এঁদের চেয়ে বয়সে বড়ো হলে কী হবে তাঁর আচরণে অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চিহ্ন। তিনি মনে করেন রণিদার চেয়েও তিনি বড়ো গোয়েন্দা। অজস্র গোয়েন্দা গল্প পড়ে তিনি মনে করেন তিনি একজন বড়ো গোয়েন্দা। এবং রণিদাকে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে টেক্কা দিতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হন। গোয়েন্দাগিরি করতে খুব আগ্রহী হলেও তিনি বেশি গভীরে যেতে চান না।

প্রথম গল্প 'সুন্দরগড় সাসপেন্স' তিনটি গল্পের মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে ছোটো। কিন্তু খুবই মুন্সীয়ানার পরিচায়ক— শেষ পর্যন্ত পাঠকদের আবিষ্ট করে রাখে। কাহিনিটির পটভূমি ওড়িশার একটি পাহাড় ঘেরা ছোটো এলাকা— সুন্দরগড়। গোয়েন্দা রণিদা তাঁর দুই সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে যান। এবং সেখানকার স্কুলের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অতিথি হন।



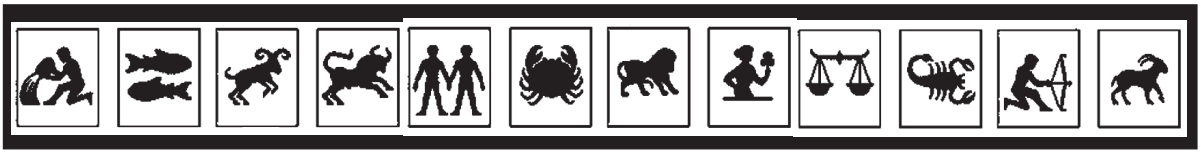
কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানতে পারেন স্থানীয় শূকরপালক মিশিরাজির খোয়াড়ে কিছুদিন ধরে শুধু মাত্র মাদি শুকরের মৃত্যু হচ্ছে। এটি খুব রহস্যজনক। রণিদা খুব আগ্রহ করে এই রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব নেন। এবং যেভাবে তিনি রহস্য সন্ধানে অগ্রসর হন তা বিস্ময়কর। অনেকের মতো তাঁর প্রথমে সন্দেহ হয় মিশিরজীর কোনো ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। কিন্তু একের পর এক বর্জনের পদ্ধতির দ্বারা তিনি যে সিদ্ধান্তে এলেন তা প্রশংসার যোগ্য।

দ্বিতীয় গল্প 'লকার রহস্য'-ও রহস্যঘন। জনৈক রুদ্র কিংশুক সান্যাল ও তাঁর স্ত্রী রঞ্জনা হন্ত দন্ত হয়ে রণিদার বাসায় এসে তাঁকে জানান যে তাঁদের লকার থেকে কে কারা প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ অলংকার সরিয়েছে যার আর্থিক মূল্য লাখ ত্রিশেক হবে। রণিদা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন তাঁদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। রণিদা সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানের দায়িত্ব নেন। একের পর তিনি অনুসন্ধানের জাল ফেলেন। গভীরভাবে সন্ধান করতে থাকেন। টান-টান উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রথমে তাঁর সন্দেহ হয় স্বামী ও স্ত্রী, দুজনের এক জনের প্রতি। কারণ তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। তারপর সন্দেহের তির ব্যাঙ্কের ক্লার্কের দিকে, তারপর রুদ্র সান্যালের শালি রোশনী দেবীর দিকে যাঁকে দেখতে ঠিক সান্যালবাবুর স্ত্রীর মতো। তাঁকে দেখতে যেহেতু সান্যালবাবুর স্ত্রীর মতো তাই রোশনী দেবীকে ব্যাঙ্কের ক্লার্কের সান্যালবাবুর স্ত্রী ভাবা অসম্ভব নয়। রোশনী দেবী এই সুযোগ নিয়ে থাকতে পারেন। এর সঙ্গে রণিদার হাতে এসেছিল রঞ্জনা ও রোশনী দেবির ডায়েরি। অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে এই ডায়েরি দুটি খঁটিয়ে পড়ে রণিদা নিশ্চিত হন রঞ্জনা এই দুষ্কর্ম করেছেন। রঞ্জনা দেবী তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন।

তৃতীয় ও শেষ গল্প 'মার্ডার ইন ভিক্টোরিয়া'। এটিও টান-টান রহস্যে মোড়া। কলকাতার ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে ঘনশ্যাম মণ্ডলের নিহত হওয়ার তদন্ত হাতে নিয়ে রণিদা পরে নিশ্চিত হন তাঁর বন্ধু কমলেশ খাস্তগীর তাঁকে হত্যা করেছেন। গল্প শুরু হতে একের পর এক জট তৈরি হচ্ছিল এবং রণিদা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সেই জটগুলি একে একে ছাড়াচ্ছিলেন। এবং সফল হন। মোট কথা গোয়েন্দা গল্প তিনটি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের গৌরব। আমরা শ্রী মজুমদারকে এমন গোয়েন্দা গল্প উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আরও গোয়েন্দা গল্প লিখে বাংলার গোয়েন্দা সাহিত্য সমৃদ্ধ করতে অনুরোধ করব। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ভারি সুন্দর। প্রচ্ছদ শিল্পী গৌতম নন্দীকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমন সুন্দর গোয়েন্দা গল্পের ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

রণিদা রহস্য ট্রিলজি।
লেখক : বিপ্লব মজুমদার।
প্রকাশক : প্রিটোনিয়া, কলকাতা।
মূল্য : ২৫০ টাকা।
প্রকাশকাল : বাংলা ১৪২২ সাল।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২৫ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) থেকে ৩ মার্চ (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে মঙ্গল, কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে শুক্র-কেতু, কুম্ভে রবি-বুধ। সোমবার সকাল ১১-৫০ মিনিটে বুধের মীনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় বিশাখা নক্ষত্র থেকে মকরে উত্তরষাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : যানবাহন, গৃহ, সম্পত্তির ক্ষেত্র শুভ তবে চালচলন, মন-মানসিকতায় সাহসিকতায় অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক সার্ভেয়ার, সাহিত্য পিপাসুদের প্রগতির পথও সুগম। সন্তানলাভ, গুণীজনের সান্নিধ্য। বিদ্যার্থী, গবেষক, কৃষকের নবউদ্যোগে ভরপুর, মনে সৃষ্টিসুখের উল্লাস।

বৃষ : যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও স্বীয় আদর্শে অবিচল থাকায় প্রশংসা ও স্বীকৃতি। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন, রমণীর সান্নিধ্য, গৃহ ও মাতৃসুখ, নতুন কর্মলাভের সফল প্রয়াস। বিলাসব্যসন, ভ্রমণে ব্যয়। বাহন চালক ও খেলোয়াড়দের এ সপ্তাহে সতর্কতা প্রয়োজন।

মিথুন : সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিজ্ঞ, কীর্তন বিশারদ, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ব্যক্তিত্ব প্রতিভার উন্মেষ, মেধা ও দক্ষতার মেলবন্ধন। সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান। অলংকার, গ্রহরত্ন, সুগন্ধী দ্রব্য, বস্ত্র, পোশাক, ওষুধ ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি শুভ। কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বজায় থাকলেও আর্থিক স্থিতি আশাব্যঞ্জক নহে। সন্তানের জ্ঞানার্জনে উদাসীনতা অবহেলা ও নিঃসঙ্গতা লক্ষণীয়।

কর্কট : বিদ্যা, কর্মে সাফল্য, ভ্রাতা-ভগ্নি ও প্রতিবেশীর সাহচর্যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি। চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধিমত্তা তথা প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণে সম্মান খ্যাতি, বেকারদের আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও হবে না শেষ। সপ্তাহের শেষভাগে সুন্দরী ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও শরীরের যত্নের প্রয়োজন।

সিংহ : বিতর্কিত মন্তব্য গৃহ ও সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতায় নিজেকে সংযত রাখুন। চঞ্চল, মানসিকতায় কর্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি ও গুরুজনের চিকিৎসায় ব্যয়। গৃহকর্ত্রীর সিদ্ধান্ত পারিবারিক সুস্থিতির অনুকূল। একাধিক উপায়ে অর্থ আয়ত্ত, সন্তানের সাফল্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

কন্যা : আত্মীয় স্বজন বান্ধবের সঙ্গে সু-সম্পর্ক। বুদ্ধির সপ্রতিভতায় লিখিত কর্মে পদোন্নতি, প্রবাস ও ব্যবসায় উন্নতি। গণিতজ্ঞ, লেখক, সাংবাদিক, প্রকাশকের সৃষ্টির বৈচিত্র্যে খ্যাতি ও স্বাভিমান। সন্তানের বাজারমুখী শিক্ষার অস্থির চিত্ত। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। তবে নিকটজনের মন্দ ব্যবহারে ব্যথিত।

তুলা : গৃহ, বাহন ও পারিবারিক মেলবন্ধন। বিদ্যার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল মনস্কাম। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। ব্যক্তিত্ব ও বাক্‌চাতুর্যে প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। প্রবাসীর স্বদেশে আগমন। নীতিগত ব্যাপারে সমঝোতা সময়ের দাবি। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর আকর্ষণ বৃদ্ধি ও মিষ্ট স্বভাবের প্রকাশ।

বৃশ্চিক : বাগ্মী, নির্দিষ্ট বিচারধারায় মর্যাদাপূর্ণ জীবন, অনুভবী, মেধা ও দক্ষতায় বিজয়ীর সম্মান। নিজ কর্মধারায় আপোশহীন পথচলা ও প্রতিভার বাস্তবায়ন। পিতার পরামর্শে বৈষয়িক উন্নতি ও নতুন ব্যবসার শুভ সূচনা। ট্রাইফয়েড, কফ-সর্দি, বদহজম ও লিখিত চুক্তিতে সতর্কতা আবশ্যক। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

ধনু : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতায় বিদ্যার্থী ও গবেষকের কারিগরি কুশলতা বৃদ্ধি। উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষে উপার্জনের একাধিক সুযোগ। গৃহ সরঞ্জাম লৌকিকতা, বিলাসব্যসনে ব্যয় বৃদ্ধি। পারপার্শ্বিক কিছু সমস্যা বিরূপ সমালোচনা, ভুল বোঝাবুঝি বিষয়ে শান্ত ও সংযত থাকা শ্রেয়। রক্তচাপ জনিত শারীরিক ক্লেশ ও চলাফেরায় সতর্কতা প্রয়োজন।

মকর : প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ব্যবসায় বিনিয়োগ, গৃহ ও বাহন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত পরিহার করুন। স্বজন বিরোধিতা ও প্রেমজ সম্পর্কে আরও সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। বকেয়া পাওনা টাকা আদায়ে বিলম্ব, ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। সন্তান-সন্ততির বিবাহ অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা, ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। সন্তান-সন্ততির বিবাহ অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা।

কুম্ভ : গৃহ সরঞ্জাম, অলংকার প্রাপ্তি। নতুন বাড়ি, গাড়ি ক্রয়ের চিন্তার বাস্তবায়ন। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদায় বিলম্ব। সহকর্মীদের বিসৃদশ আচরণে মর্মপীড়া। বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনে ও গবেষণায় সুধীজনের সাহচর্য, উৎসাহ ও সাফল্য। সামাজিক উন্নয়ন ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় ভরপুর মন ও মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি।

মীন : বহুদিনের কঙ্ক্ষিত ফল ও কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য ও নিজ প্রতিভার বাস্তবায়ন ও ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। শিষ্টাচার, সৌন্দর্য, বিনয়, নম্রতা, অকৃত্রিম ভালোবাসার জীবনদৃষ্টি। নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ, মেধা ও দক্ষতা। মানবহিতৈষী, দরদীর ভূমিকা পালন।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য